তিনিই আমার রব

শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি

দ্বিতীয় খন্ড

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

তিনিই আমার রব

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রকাশকের অনুভূতি

সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহ তাআলার, যিনি এই সুবিশাল আকাশ, বিস্তৃত ভূমি, প্রকাণ্ড গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে আমাদের দান করেছেন জীবন, জীবনোপকরণ, সুখ-সমৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির এক অটুট মেলবন্ধন। অজস্র সালাম ও অগণিত দরুদ প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। দুনিয়ার বুকে রেখে গেছেন সৃষ্টির সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুপম চরিত্র।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে। সেই পরম সুন্দর ও শাশ্বত নামসমূহকে বলা হয় 'আল-আসমাউল হুসনা'। এতে আল্লাহর মহত্ত্ব, ক্ষমতা, অনুগ্রহ, অমুখাপেক্ষিতা, সৃজনশীলতা ও একচ্ছত্র মালিকানাকে শব্দমালায় গাঁথা হয়েছে; বান্দার প্রতি আল্লাহর পরম দয়া ও অনুগ্রহ এবং সৃষ্টির ওপর তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের বিবরণ এসেছে।

ইতঃপূর্বে সমকালীন প্রকাশন থেকে আল্লাহ তাআলার কিছু গুণবাচক নামের ওপর শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি রচিত *তিনিই আমার রব* বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর অশেষ করুণা ও মেহেরবানিতে বইটি পাঠকমহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনেকেই বইটির দ্বিতীয় পর্ব এবং ক্রমান্বয়ে আল্লাহর সুপ্রসিদ্ধ ৯৯টি গুণবাচক নাম নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিন্তু এই বিষয়ে অতটা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় রচিত তেমন কোনো রচনা

আমাদের চোখে পড়ছিল না, যা *তিনিই আমার রব* বইয়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে সিরিয়ার বিশিষ্ট আলিম শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসির দারস-সংবলিত *খাওয়াতির ওয়া তাআম্মুলাত ফি শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা* গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থে আল্লাহ তাআলার ২০টি গুণবাচক নাম নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই সবগুলো নাম এক মলাটে আবদ্ধ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া এ গ্রন্থের কয়েকটি নাম নিয়ে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত *তিনিই আমার রব* বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাই উক্ত গ্রন্থের ২০টি গুণবাচক নাম থেকে বাছাই করে ৮টি নাম নিয়ে রচিত হলো *তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)* বইটি।

তিনিই আমার রব বইটিতে আল্লাহর ১০টি গুণবাচক নামের সমাহার ছিল। যথা—**এক.** আস-সামাদ। **দুই.** আল-হাফিয। **তিন.** আল-লাতিফ। **চার.** আশ-শাফি। **পাঁচ.** আল-ওয়াকিল। **ছয়.** আশ-শাকুর। **সাত.** আল-জাব্বার। **আট.** আল-হাদি। **নয়.** আল-গাফুর। **দশ.** আল-কারিব। পাঠকের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে উল্লিখিত নামগুলোর বাইরে আরও ৮টি নাম নিয়ে হাজির হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি। নামগুলো যথাক্রমে—

এক. আল-ফাত্তাহ। **দুই.** আল-ওয়াহহাব। **তিন.** আল-আজিজ। **চার.** আল-কারিম। **পাঁচ.** আর-রাযযাক। **ছয়.** আল-খাবির। **সাত.** আর-রাকিব। **আট.** আল-বাসির।

তিনিই আমার রব সিরিজের দ্বিতীয় বই প্রকাশ করতে পেরে সমকালীন পরিবার আনন্দিত। এই বইয়ের পরতে পরতে পাঠক তার স্রষ্টার সাথে পরিচিত হবেন, নতুন করে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁর মহত্ত্ব ও দয়ার ব্যাপকতা জানতে পারবেন—এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আল্লাহ তাআলার কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন এ বইটি কবুল করে নেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন
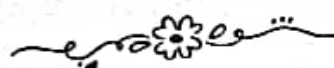
অনুবাদকের অনুভূতি

একগুচ্ছ সুন্দর ও নান্দনিক নামের সুবাসিত ফুল। প্রতিটি ফুলের পাপড়িতে লুকিয়ে রয়েছে সৃষ্টির প্রতি অগাধ প্রেম-ভালোবাসা এবং দয়া-অনুগ্রহের কোমল পরশ।

প্রতিটি নামই জ্ঞান, উপলব্ধি, চেতনা ও বিস্ময়ের একেকটি মহাসমুদ্র। মহাকালের ক্যানভাসে আঁকা বর্ণিল ছবি। রংধনুর মতো সাত রঙে রঙিন। সে নামের রং ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, সূর্যালোকে। গাছের সবুজ পাতায়। পুষ্পের কোমল পাপড়িতে। আধো আধো বোল ফোটা নিষ্পাপ শিশুর এলোমেলো চাহনিতে; তার মিষ্টি হাসিতে।

এ নামে রয়েছে স্রষ্টা ও তাঁর অনুপম সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের মেলবন্ধন। বিশ্বজগতের সাথে ঊর্ধ্বলোকের মহাকর্ষণ। এতে উচ্চারিত হয়েছে সৃষ্টি ও সৃষ্টি-জীবের সুষ্ঠু প্রতিপালন এবং নিবিড় পরিচর্যার সাতকাহন। বিশ্বজগৎ ও মহাবিশ্বের সবকিছুর একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিকানার অকুণ্ঠ প্রকাশ। সৃজন, প্রতিপালন, ধ্বংস ও পুনরুত্থানের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা।

সেই পরম সুন্দর শাশ্বত নামগুলোই আল-আসমাউল হুসনা; মহান আল্লাহর গুণবাচক নান্দনিক নামসমূহ।

আল্লাহর বান্দা হিসেবে এসব নামের অর্থ জানা, এগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করা এবং আবেদন ও শিক্ষা বাস্তব জীবনে ধারণ করা আমাদের ঈমান ও ঈমানদীপ্ত অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চলতি পথে একজন মানুষের সাথে দেখা হলে, পরিচিতি পর্বে আমরা তার নাম জিজ্ঞেস করি। তার কর্ম-পেশা, রুচি-অভিরুচি, সামাজিক

অবস্থান, ব্যক্তিত্ব, অর্জন ও সাফল্য—এক কথায় জীবন সংশ্লিষ্ট নানান প্রশ্ন করি। এতে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাশোনা হয়। যা পরবর্তীতে সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের ভিত তৈরিতে বুনিয়াদি ভূমিকা পালন করে। এভাবেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে আসে, দিনে দিনে আপন হয়ে ওঠে। বিপদাপদে, সুখে-দুখে, এমনকি জীবনের অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তগুলোয় একে অপরের সঙ্গী হয়ে পাশে দাঁড়ায়।

তাহলে যে মহান মালিক আমাদের স্রষ্টা, আমাদের রব, আমাদের একমাত্র ইলাহ; আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু যার সম্মুখে সিজদাবনত; যার শোকরগোজারি আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন, তাঁর সুন্দর নাম এবং গুণাবলি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সুমহান আল্লাহ বলেন—

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

আল্লাহর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। অতএব, তোমরা সে নামেই তাঁকে ডাকো। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদের বর্জন করো। শীঘ্রই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।[১]

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ... ﴿١١٠﴾

বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে কিংবা রহমান নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন, সকল সুন্দর নান্দনিক নামই যে তাঁর।[২]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ... ﴿٢٨﴾

বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে, তারাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে চলে।[৩]

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮০

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১১০

[৩] সুরা ফাতির, আয়াত : ২৮

বলা বাহুল্য, আল্লাহর পরিচয় লাভের মাধ্যম হলো—তাঁর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা। তাঁর নান্দনিক নামসমূহের নিগূঢ় অর্থ এবং এর পেছনের রহস্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা। তাত্ত্বিকতার সীমা পেরিয়ে বাস্তব জীবনের ঘটনা প্রবাহের মাঝে তাঁর রুবুবিয়্যাতের[১] স্পর্শ খুঁজে নেওয়া। জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও ছন্দপতনের মাঝে সত্যি সত্যিই যদি কেউ মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাত[২] ও রুবুবিয়্যাতের ছোঁয়া পেয়ে যায়, তবে জীবন তার ধন্য। দুনিয়া ও আখিরাতে সে সফলকাম।

কিন্তু মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের রহস্য কজনই বা উদ্ধার করতে পারে? জীবনের ঘটনা প্রবাহের সাথে সেগুলোর যোগসূত্র এঁকে কজনই বা সেগুলোকে জীবনবান্ধব করে তুলতে পারে? এ কাজের জন্য প্রয়োজন হয় তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির; গভীর বোধ ও উপলব্ধির। পৃথিবীর ঘটনাপুঞ্জের সূক্ষ্ম ও সঠিক বিশ্লেষণের। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার সাথে হৃদয়ের সেতুবন্ধনের। যাকে আল্লাহ তাআলা এসব নিয়ামত দান করেছেন, সে তো নিজে নিজেই উপলব্ধি করে মহান আল্লাহর প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য। তাঁর করুণা, ভালোবাসা, প্রতাপ ও অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করে তাঁর সম্মুখে হয় সিজদাবনত।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য, তাঁর নান্দনিক নামসমূহের সৌন্দর্য এবং জীবনের সাথে সেগুলোর সম্পর্কের সূত্র আবিষ্কার করতে পারে না। তাই তাদের জন্য প্রয়োজন ঈমান জাগানিয়া কারো সাহায্যের। সে সাহায্য আসতে পারে কোনো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখা কোনো বই থেকে। সমকালীন প্রকাশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ—তারা এমন মহৎ কাজের জন্য 'তিনিই আমার রব' নামে একটি সিরিজ শুরু করেছে। প্রায় দু-বছর আগে এ সিরিজের প্রথম বই *তিনিই আমার রব* প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, বইটিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আশাতীত পাঠকপ্রিয়তা দান করেছেন। হাজারো পাঠক এ বইটি পড়ে আল্লাহর পরিচয় লাভ করে দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে। বইয়ের প্রতিটি শব্দে ও বাক্যে পাঠকরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছে, জীবনের ছন্দে ছন্দে মহান আল্লাহর কী অপার কুদরত ঘিরে রেখেছে আমাদের। রহমান

---

[১] রুবুবিয়্যাত: 'রব' শব্দের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে রুবুবিয়্যাত বলা হয়েছে। এর অর্থ—পালন কর্তৃত্ব, প্রতিপালকত্ব।

[২] উলুহিয়্যাত: 'ইলাহ' শব্দের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে 'উলুহিয়্যাত' বলা হয়েছে। এর অর্থ—প্রভুত্ব, উপাস্যতা।

অর্থ দয়াময়; সামাদ অর্থ অমুখাপেক্ষী; আল-হাফিয অর্থ মহারক্ষক—এ সবই তো জানা; কিন্তু তিনি এমন অমুখাপেক্ষী, এত অসীম দয়ালু এবং এমন অভিনব পন্থায় এমন সুনিপুণ কারিশমায় বান্দাকে রক্ষা করেন তা তো পূর্বে কখনো ভাবা হয়নি! তাই পাঠক হারিয়ে যায় জীবনের বাস্তবতায়; দোল খেতে থাকে আল্লাহর নামের সুর-তরঙ্গে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)* বইটির লেখক সিরীয় আলিম শাইখ ডক্টর রাতিব আন-নাবুলুসি। তিনি দামেশক ইউনিভার্সিটির তারবিয়া ফ্যাকাল্টির সাবেক প্রভাষক। পাশাপাশি দামেশকের 'আব্দুল গনি আন-নাবুলুসি জামি মসজিদ'-এর সম্মানিত খতিব। এ মসজিদে তিনি 'আল-আসমাউল হুসনা'র ওপর একটি ধারাবাহিক দারস প্রদান করে থাকেন। এ ক্লাসে উপস্থিত হন দামেশক এবং দামেশকের বাইরের শিক্ষার্থী, জ্ঞানী-গুণী, ডক্টর, প্রফেসর-সহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ। দামেশকে তার এই ক্লাস খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্লাসে অংশগ্রহণ করে অনেক পথভোলা মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। আল্লাহর পরিচয় লাভ করে দ্বীনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন। তার সেই ধারাবাহিক আলোচনাগুলোই মলাটবন্ধ হয়ে পাঠকদের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। *তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)* মূলত সে বইটিরই সরল অনুবাদ। আল্লাহ তাআলার কাছে আকুতি জানাই, তিনি যেন এ বইটিকেও কবুল করে নেন এবং আল্লাহবিমুখ মানুষগুলোকে দ্বীনের পথে ফিরে আসার কার্যকরী অসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ • وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

দুআপ্রার্থী

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মুরতাযা
২৩ জিলকদ, ১৪৪০ হিজরি

সূচিপত্র

আল-ফাত্তাহ : اَلْفَتَّاحُ

কল্যাণ ও অনুগ্রহের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচনকারী

সম্ভাবনার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যখন মৃত্যু এসে উঁকি দেয় দু-চোখের সামনে, জীবনের সব আশা-ভরসা তখন নিঃশেষ হয়ে যায়। একদল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কয়েক ঘণ্টা পর মৃত্যুর ঘোষণা দিলে প্রিয় মুখগুলোয় নেমে আসে শোকের কালো ছায়া। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে যেতে পারে করুণার রুদ্ধ দ্বার। আবছা আলোয় ভরে যেতে পারে উঠোন-ঘর, আবার জেগে উঠতে পারে নতুন জীবনের প্রত্যয় নিয়ে। সবাই যেখানে ব্যর্থ, সকল দ্বার যেখানে রুদ্ধ, তখন আকস্মিকভাবে যিনি করুণার দুয়ার খুলে দেন, মৃত হৃদয়ে পুনরায় আশার আলো জাগিয়ে তোলেন, তিনিই আল-ফাত্তাহ।

☆☆☆

আমার এক বন্ধুর বাচ্চা জন্ম নেয় সিজারের মাধ্যমে। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সিজার। ভ্যাকিউয়াম এক্সট্র্যাক্টরের মাধ্যমে বাচ্চাটিকে টেনে বের করা হয়। কিন্তু বাচ্চার মাথায় যন্ত্রটি রাখার সময় মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। মস্তিষ্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যতই দিন যায়, ততই বাচ্চাটির শরীরে কাঁপুনি বাড়তে থাকে। আমার বন্ধু প্রথমে যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলো, তার মন্তব্য ছিল এমন—'বাচ্চাটির মস্তিষ্কের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। সে বড় হলে অন্ধ কিংবা প্রতিবন্ধী হবে।' আমরা তাকে পরামর্শ দিলাম, তিনি তো নতুন ডাক্তার! তুমি বরং বড় কোনো

শিশু-বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাও। দামেশকের সবচেয়ে বড় শিশু-বিশেষজ্ঞের কাছে নেওয়া হলো বাচ্চাটিকে। তিনিও আগের ডাক্তারের মতো একই কথা বললেন। এভাবে আরো চার-পাঁচজন ডাক্তারকে দেখানো হলো। সবার ঐ একই মন্তব্য। যেন সবাই মিলে জোট বেঁধেছেন, কারো কথায় কোনো কমবেশ নেই, একই কথা, একই উচ্চারণ। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বাচ্চাটিকে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। কিন্তু সেখানেও ডাক্তারদের মন্তব্যের কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ আঘাতটা ছিল মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্কের আঘাত সাধারণত ভালো হয় না। স্নায়ুকোষ বড় হয় না—এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবধারিত নিয়ম। স্নায়ুকোষ বৃদ্ধি পেলে অসহনীয় যন্ত্রণায় মানুষ মারা যেত। এটাও আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, স্নায়ুকোষ কখনো বাড়ে না।

ডাক্তাররা সকলেই একমত হয়ে গেলেন, এই ছেলে বড় হলে নিশ্চিত অন্ধ, পাগল নয়তো প্রতিবন্ধী হবে। চিন্তা করে দেখুন, তার বাবা-মায়ের অবস্থা কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন! কোনো মা-বাবাই চায় না, তার সন্তান এমন শাস্তির মাঝে বেঁচে থাকুক। এর চেয়ে বরং চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যুও অনেক ভালো ছিল।

আশা-নিরাশার মাঝেই সর্বশেষ একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ডাক্তারটি কিছুটা দ্বীনদার ও ঈমানদার ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ চাইলে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে যাবে। এরপর তিনি ব্রেইনের একটি টেস্ট করলেন এবং প্রেসক্রিপশান লিখে দিলেন। আল্লাহর কী রহমত, মাত্র ছয় মাসের মাথায় বাচ্চাটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল! তার দেহে দুশ্চিন্তা করার মতো আর কোনো সমস্যা পাওয়া গেল না। বর্তমানে ছেলেটির বয়স ১২ বছর। সে হাঁটা-চলা, খেলাধুলা সবই করতে পারে। এমনকি সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়, সবচেয়ে বেশি মেধাবী। আপনি কি অনুভব করতে পারছেন, মহান আল্লাহর নাম কেন আল-ফাত্তাহ? কারণ ডাক্তাররা সকল দুয়ার বন্ধ করে ফেলেছিল, চিকিৎসার কোনো দুয়ার আর খোলা ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহ নিজ করুণায় আরোগ্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। বাচ্চাটিকে সুস্থ করে তুলেছেন; তার মা-বাবার আত্মাকে শীতল করেছেন।

যিনি খুলে দেন রিযিকের দুয়ার, চাকরির দুয়ার; যিনি আপনার বিয়ের সুব্যবস্থা করেন, খুলে দেন আত্মিক প্রশান্তির দরজা, হৃদয়ের একাগ্রতা আর নেক কাজের দুয়ার; তিনিই অবারিত করেন দুআ কবুলের কপাট, খুলে দেন সমস্ত রুদ্ধ দ্বার। তাঁরই সুন্দরতম নাম আল-ফাত্তাহ।

সুমহান আল্লাহ বলেন—

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহের দ্বার উন্মোচিত করলে তার নিবারণকারী কেউ নেই। তিনি কিছু বন্ধ করতে চাইলে তার উন্মুক্তকারী কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

আয়াতটি মুমিন-হৃদয়ের সদা গুঞ্জরিত মুগ্ধকর এক প্রতিধ্বনি। আপনি যখন উপলব্ধি করবেন, সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর, তখন অবশ্যই আপনি তাঁর অভিমুখেই যাত্রা শুরু করবেন। তিনি যে দুয়ার উন্মোচন করেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই। আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুই স্রেফ ছায়ামূর্তি। না পারে নিজ ইচ্ছায় নড়তে; না পারে সামনে এগুতে বা পিছু হটতে। বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম, প্রিয় মানুষ, প্রিয় নবি, নবিদের সর্দার—যার কাছে স্বয়ং আল্লাহ আসমান থেকে ওহি প্রেরণ করেন, তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ—

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ⑱⑱

বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজের কোনো লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না।[২]

আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যদি আল্লাহর এই নির্দেশ হয়, নবিই যদি নিজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে অবগত না হন, তাহলে কেউ কোনো কিছুর মালিক কীভাবে হতে পারে? অতএব, আল্লাহই সবকিছুর উন্মোচনকারী, আল্লাহই সবকিছুর নিরুদ্ধকারী।

করুণার দ্বার উন্মোচনকারী

দুই পক্ষের মাঝে অধিকারের প্রশ্নে প্রত্যেকেই নিজেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে। কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই অসংখ্য অভিযোগের তির নিক্ষেপ করতে

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ২

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৮

থাকে একে অন্যের দিকে। তখন সুযোগসন্ধানী তৃতীয় পক্ষ মাঝখানে সমঝোতা করতে এলে যার প্রাপ্য এক কেজি তাকে দেয় দুই কেজি। সে যেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আসে তাই অপর পক্ষের কিছু বলার থাকে না। কিন্তু কে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত? কার দাবি সত্য? সুনির্দিষ্ট এবং সঠিকভাবে কে সিদ্ধান্ত দেবে?

এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহই দিতে পারেন। তাই আল-ফাত্তাহ মেঘে ঢাকা সূর্যকে যেভাবে উন্মোচন করেন, ঠিক তেমনি সত্যকে মেলে ধরেন সকলের সামনে। শুআইব আলাইহিস সালামের মুমিন সাথিগণ উদ্ধত কাফিরদের লক্ষ্য করে বলেছিল—

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানের অধীন, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায্য মীমাংসা করে দিন। আপনিই তো শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।[১]

মহান আল্লাহর এই নামের সাথে আপনার সম্পর্ক উপলব্ধি করুন। যদি আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। কারণ আল্লাহই সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক। হয়তো বা মানুষ আপনার নামে অনেক কিছু বলে বেড়াবে; বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিযোগের তির নিক্ষেপ করবে। কিন্তু আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে ভয়ের কোনো কারণ নেই। মহান আল্লাহর এই মূল্যবান বাণী কখনোই ভুলে যাবেন না—

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৮৯

আর কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি রয়েছেন সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন—

قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

বলুন, আল্লাহই; (আল্লাহই নাযিল করেছেন সেই কিতাব, যা মুসা নিয়ে এসেছিল)। অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনার খেলায় মগ্ন হতে দিন।[২]

সকল অস্পষ্টতা দূর করে আল্লাহ প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করেন। যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, লোকের কথায় তার কীই বা আসে যায়!

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন—

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۝

বলুন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্র করবেন, এরপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।[৩]

আমাদের জীবনে অস্থিরতা কেন আসে

একটি বিশাল ফ্যাক্টরি। দশ জনের মতো উদ্যোক্তা আর অংশীদার মিলে ফ্যাক্টরিটি দাঁড় করানো হয়েছে। ধরুন, এখানে কর্মরত কোনো ব্যক্তিকে দশ জনের আদেশই পালন করতে হবে। সবাই একমত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও, সবার আদেশ পালন করতে গিয়ে সে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠবে। কারণ প্রত্যেকের আদেশ-নির্দেশ

---

[১] সুরা নামল, আয়াত : ৭৯

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৯১

[৩] সুরা সাবা, আয়াত : ২৬

বিপরীতমুখী হতে পারে। কেউ আসতে বলবে তো কেউ বলবে যেতে। কেউ লাঞ্চের পর বিশ্রাম নিতে বলবে, আবার কেউ বলবে দ্রুত কাজ শুরু করতে। তারা একমত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার পরও কিন্তু এত ভোগান্তির শিকার হতে হবে। তাহলে যদি তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না থাকে; একে অপরের সাথে ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকে, তখন অবস্থা আরো কত ভয়ানক হবে তা সহজেই অনুমেয়।

অতএব, মানুষের জীবনে একাধিক অংশীদার থাকা মানেই চরম ভোগান্তি! এক জীবনে ভিন্নমুখী দাবি পূরণ করতে যাওয়াই অস্থিরতার সৃষ্টি করে। আজ মানুষের জীবনে অস্থিরতার কোনো শেষ নেই। কারণ মানুষের জীবন একজনের দাবী পূরণের দিকে নিবিষ্ট নয়। কাফির, মুশরিক ও অমুসলিমদের জীবন ঈমানশূন্য ও খাপছাড়া। কখনো নেতার মন খুশি করা, কখনো অধীনস্থের মন ভোলানো, কখনো স্ত্রীকে খুশি করা—এ জাতীয় নানান ব্যস্ততায় জীবন তার ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীদের খুশি করতে গেলে স্ত্রী ক্ষেপে যায়। স্ত্রীকে সময় দিতে গেলে বন্ধু-বান্ধব ও পার্টনাররা চটে যায়। আশপাশের লোকজন ও প্রতিবেশীদের খুশি করতে গিয়ে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়। বিভিন্ন উৎসব অয়োজনে অংশগ্রহণ না করলে আত্মীয়-স্বজন মনঃক্ষুণ্ণ হয়। তার পুরো জীবনই অসংলগ্ন। তার জীবনে অস্থিরতা, অশান্তির কোনো শেষ নেই।

কিন্তু মুমিন বান্দার জীবন এক মালিকের সমীপে সমর্পিত। শুধু তাঁর দিকেই নিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত; তাঁর সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করেই সে অন্যকে খুশি করে। তাই তার জীবনে অস্থিরতা নেই। আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রশান্তি এবং জীবনের স্বস্তি তার পরম প্রাপ্তি। আল্লাহ বলেন—

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না; অন্যথায় আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।[১]

আল্লাহর সাথে অন্য কারো উপাসনা করা, অন্য কাউকে ডাকা, এটাও মানবাত্মার ওপর বিরাট এক শাস্তি। জীবনের অশান্তি-অস্থিরতা সেই শাস্তির বহিঃপ্রকাশ।

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ২১৩

আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকার অর্থ শুধু এই নয় যে, তাকে আপনি ইলাহ নামে ডাকবেন। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করার মতো যদি অন্য কারো ওপর ভরসা করেন, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার মতো যদি অন্য কোনো বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করেন, আল্লাহর অবাধ্যতা করে আপনি যদি কোনো মাখলুকের আনুগত্য করেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনি তাকে আল্লাহর মতোই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

অথচ মানুষ যখন পবিত্র হয়, যখন তার হৃদয়-আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করে দেন। সে দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে; কিন্তু দুনিয়া তার কাছে আসে অবনত হয়ে।

হৃদয়ের পবিত্রতা এবং নফসের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে যদি আপনি মর্যাদার আসনে উন্নীত হতে পারেন, তাহলে দুনিয়া আপনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস দেখুন। হাদিসটি আমি কখনো ভুলতে পারি না।

যায়িদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

দুনিয়াই হবে যার চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, আল্লাহ তার সবকিছুকে বিভক্ত করে দেবেন; তার কপালে সেঁটে দেবেন দারিদ্র্যের কালিমা। দুনিয়া তার কাছে ততটুকুই ধরা দেবে, যতটুকু তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। দুনিয়া এর বেশি তার কাছে একচুল পরিমাণও আসবে না।

আর যে বান্দার আগ্রহ-অনুরাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হবে আখিরাত, আল্লাহ তার সবকিছু গুছিয়ে দেবেন। অন্তরাত্মায় তাকে বানিয়ে দেবেন ধনী; আত্মিক প্রাচুর্যের অধিকারী। সে দুনিয়াকে মনে করবে তুচ্ছ, নগণ্য; কিন্তু দুনিয়া তাকে ধরা দেবে নত, লাঞ্ছিত হয়ে।'[১]

দুনিয়ার ভালোবাসায় যে একবার মজেছে, তিনটি বিপদ কখনো তার পিছু ছাড়বে না—হন্যে হয়ে ছুটোছুটি; যেখানে ক্লেশের কোনো শেষ নেই। অসীম আশা-আকাঙ্ক্ষা; যা অপূরণীয়ই রয়ে যাবে। আজীবন দারিদ্র্যের গ্লানি; যার কোনো অন্ত নেই।

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১০৫

কিন্তু মুমিন কখনো দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয় না। মুমিনের জীবন-উপভোগ যতটুকুই থাকুক তার সম্পূর্ণটাই উত্তম। তাতে রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি এবং হৃদয়ের পরিতৃপ্তি। তার সাথে রয়েছে জান্নাত প্রাপ্তির রঙিন কোমল স্বপ্ন; যার প্রশস্ততা আসমান-জমিন পরিব্যাপ্ত। কিন্তু কাফিরের জীবন উপভোগে রয়েছে শুধুই অস্থিরতা। অজানা ভবিষ্যতের পথে ভয়ংকর যাত্রা। অনিশ্চিত আগামীর তীব্র শঙ্কা।

মুমিন দুনিয়ার সামান্য উপকরণ পেয়েও সম্পূর্ণ তৃপ্ত। তার হৃদয় থাকে প্রশান্ত। কারণ আখিরাতে আল্লাহ তার জন্য যে সীমাহীন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে থাকে। তাই সামান্য প্রাপ্তিতেও তার প্রশান্তি হয় অসামান্য। কিন্তু কাফির দুনিয়াবি ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করেও এক অজানা আগামীর ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত। ভয়-শঙ্কা-উৎকণ্ঠা তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার সর্বনিম্ন ভয় হলো, সম্পদ হারানোর ভয়। তাই মৃত্যু তার জন্য চরম শঙ্কার বিষয়। এত কষ্টে অর্জিত সম্পদ মৃত্যু এসে এক নিমিষেই কেড়ে নেবে—এই ভয়ে সে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত। সম্পদ প্রাপ্তির পর সেই সম্পদ হারানো যে বড় কষ্টের! এজন্যই আল্লাহর কাছে দুআ করি, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে; শত্রুর হাসির পাত্রে পরিণত হওয়া থেকে এবং নিয়ামতপ্রাপ্তির পর আবার তা ছিনিয়ে নেওয়া থেকে।'

মুমিন কখনো মৃত্যুকে ভয় পায় না। মৃত্যু তার জন্য পরম আগ্রহের বিষয়। এজন্য দেখবেন মুমিনের শেষ জীবন শুরুর জীবনের তুলনায় অধিক সুখময় হয়ে থাকে। জীবনের প্রথমদিকে মুমিন একটু দারিদ্র্য-সংকটের শিকার হয় কিন্তু জীবনের শেষ দিকে আল্লাহ তাকে স্বস্তি দান করেন। আর কাফিরকে জীবনের প্রারম্ভে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, ভোগে-তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেন। কিন্তু শেষ জীবনে তাকে গ্রাস করে লাঞ্ছনা, অপমান ও সীমাহীন দারিদ্র্য। তাই আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য নিচের দুআটি করা অপরিহার্য—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَارِنَا أَوَاخِرَهَا وَخَيْرَ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ نَسْأَلُكَ لِقَاءً تَرْضَى عَنَّا فِيْهِ

হে আল্লাহ, জীবনের শেষ দিনগুলো আমাদের জন্য উত্তম বানিয়ে দিন। আর সেই দিনটিকে আমাদের জন্য সর্বোত্তম বানিয়ে দিন, যেদিন আমরা আপনার সান্নিধ্যে ধন্য হব। আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি এমন সাক্ষাৎ যাতে আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

ডাক্তার যদি জানিয়ে দেয় যে, রোগীকে আর বাঁচানো যাবে না, তবুও ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। কারণ অদৃশ্যের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতেই। কত ডাক্তার রয়েছে, রোগীর পরিবারকে বলে দিয়েছে, আর মাত্র চার ঘণ্টা পর রোগীর হায়াত শেষ। স্বজনেরা শোক প্রকাশ করতে শুরু করে। এরপরও দেখা যায়, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে রোগীকে ভালো করে দিয়েছেন। এমনও হতে পারে যে, রোগী পরবর্তীতে ৩০ বছর হায়াত পেয়েছে, কিন্তু সেই ডাক্তার মৃত্যুবরণ করেছে আরো এক যুগ আগে।

মানুষ শুধু জানতে পারে বর্তমানের অবস্থা। ভবিষ্যৎ কী হবে বা কী হতে চলেছে—সে সম্বন্ধে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নন। কারণ অদৃশ্যের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁর কাছেই।

খুবই নিরাপদ ও সমৃদ্ধ শহর। সম্পদ, প্রাচুর্য কোনো কিছুর অভাব নেই। মূল্যবান সব খনিজে পরিপূর্ণ। কে বিশ্বাস করবে এই শহর কখনো দাউদাউ করে আগুনে জ্বলতে পারে? কে বিশ্বাস করবে এই শহর একসময় ভূতুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে?

১৯৭৪ সনে লেবানন ছিল ভূস্বর্গ। শান্তি, নিরাপত্তা, সচ্ছলতা, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তাদের। উন্নত বিশ্বের সকল সুযোগ-সুবিধাই সেখানে ছিল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু বর্তমানে কেউ লেবানন সফরে গেলে, তার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হবে যে, এই লেবানন একসময় ভূস্বর্গ ছিল।

লেবানন ট্রাজেডির বিশ্লেষণ অনেকে অনেকভাবে করে থাকেন।

দ্বীনি চেতনা এবং কুরআনের আলোকে এর ব্যাখ্যা অন্যরকম। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

....

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের; যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যেখানে চারদিক থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর সেই জনপদ আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ। তাদের কাছে তাদের মধ্য হতেই একজন রাসুল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান

করল। তখন শাস্তি তাদের এমতাবস্থায় পাকড়াও করল যে, তারা ছিল সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত।[১]

অদৃশ্যের সকল চাবিকাঠি কেবল আল্লাহর কাছেই—

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ۝٥٩

অদৃশ্যের চাবিকাঠি শুধু তাঁর নিকটেই; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।[২]

আপনি যদি দৃঢ় বিশ্বাস করেন, একমাত্র আল্লাহর নিকটই অদৃশ্যের চাবিকাঠি; তাহলে কখনোই আপনি অন্য কোনো অদৃষ্ট সংবাদদাতাকে বিশ্বাস করবেন না।

ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, গণক, জ্যোতিষী এবং জাদুকরদের আপনি অবশ্যই পরিত্যাগ করবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, এই আধুনিক যুগে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে আপনি প্রায়ই শুনবেন, সেখানে জ্যোতির্বিদ বা গণক আছে। অনেক নামিদামি সম্পদশালী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সেলিব্রিটিরা তাদের কাছে নিয়মিত আনাগোনা করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চায়। তাদের কথাকে ঐশী বাণীর মতো সত্য মনে করে। কিন্তু জ্ঞানশূন্য এই অসহায় মানুষগুলোর জানা নেই, এগুলোর সবই আসলে ধোঁকা।

কোনো গণকের কাছে আপনি ভবিষ্যতের সংবাদ জানতে চাওয়া মানেই আপনি আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারেননি। আর যখন আপনি গণকের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসেন; অনাগত ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চান, তখন আপনি চূড়ান্তভাবেই প্রমাণ করে দেন, আল্লাহর সাথে আপনার কোনো

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ১১২-১১৩

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৫৯

পূর্বপরিচিতি নেই। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে, সে কখনো এসব প্রতারকের গ্রাসে পরিণত হতে পারে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভাগ্যগণনা করাল এবং তাকে বিশ্বাস করল, প্রকৃতপক্ষে সে মুহাম্মাদের ওপর নাযিলকৃত দ্বীনের কুফরি করল।'[১]

কুরআনের এই আয়াতকেও সে অস্বীকার করল—

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

বলুন, আমি তোমাদের নিকট এ কথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে; তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয়াবলি সম্বন্ধেও অবগত নই। এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?' তোমরা কি অনুধাবন করো না?[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। শুধু তাঁর মনোনীত রাসুল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[৩]

কী বিস্ময়কর আয়াত! আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্যের খবর আর কেউ জানে না। অদৃশ্যের জ্ঞান তিনি কারো নিকট প্রকাশ করেন না। অতএব, যদি আপনি এমন কোনো প্রতিবেদন পড়েন যাতে নিশ্চিতভাবেই কোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাহলে সেটাকে বিনাবাক্য ব্যয়ে প্রত্যাখ্যান করুন। হ্যাঁ, যদি শুধু সম্ভাবনা বোঝাতে

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৫৩৬

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৪৮

[৩] সুরা জিন, আয়াত : ২৬-২৭

কোনো খবর প্রকাশিত হয়, তবে তা পড়তে দোষ নেই। যেমন : আবহাওয়া বার্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা বিশ্বের কোনো সংকটময় পরিস্থিতির বিশ্লেষণ; বিশ্ব যার মুখোমুখি হতে চলেছে।

যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা তো আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে। যে সময়ের আশায় আপনি বুক বেঁধে রয়েছেন তা অনিশ্চিত। আপনার হাতে আছে শুধুই বর্তমান। এখনই সময় ফিরে আসার। ফিরে আসুন, তাওবা করুন আল্লাহর সম্মুখে।

আল-ফাত্তাহ খুলে দিলেন হৃদয়ের কপাট

ফিলিস্তিনের নাবলুস জামে মসজিদে তাফসিরের দারস দিতাম আমি। প্রায় ১৬ বছর যাবৎ এক বোন এই দারসে অংশ নিতেন। তার মেয়ের জামাই ছিল একদমই ইসলামবিমুখ। দ্বীন-ধর্মের সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্কও ছিল না। সে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত। পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, সে ছিল একজন নাস্তিক। ঐ বোন তার মেয়ের মাধ্যমে জামাইকে দারসে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। এভাবে দুই বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কোনোভাবেই সে আসতে রাজি নয়। কিন্তু মেয়ে একদিনের দারসে এসে আলোচনা শুনে আবেগ-আপ্লুত হয়। সে তার মাকে কথা দেয়, অবশ্যই স্বামীকে সাথে করে নিয়ে আসবে।

পরপর দুই সপ্তাহ তার স্বামী দারসে আসে আর এতেই তার জীবনে অবিশ্বাস্য রকমের পরিবর্তন দেখা দেয়।

এর কিছুদিন পরই লোকটি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রহমতই হয়তো তাকে কুরআনের দারসে টেনে এনেছিল। জরুরি অবস্থায় তাকে এ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ্যাম্বুলেন্সের বেডে শুয়ে থেকেই সে তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে এক অমূল্য অসিয়ত করে।

আপন সন্তানদের সে নিজের আদলেই গড়ে তুলেছিল জীবনভর। অবিশ্বাসকেই তাদের হৃদয়ের পরম বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই আস্থাভাজন সন্তানদেরকে মৃত্যুশয্যায় সে অসিয়ত করল, 'দেখো, তোমাদেরকে এতদিন আমি যা কিছু বলেছি, তোমাদেরকে যে দীক্ষায় দীক্ষিত করেছি তার সবই ছিল মিথ্যে, বাতিল আর অর্থহীন। সত্য সেটাই যা আল-কুরআনে এসেছে!'

তার অন্তিম মুহূর্তের এই কথাগুলো আমি কখনো ভুলতে পারব না।

যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে তা আপনার হাতছাড়া। ভবিষ্যতের রঙিন যত স্বপ্নের ছবি আপনি আঁকছেন তার সবই অনিশ্চিত। অতীতে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আপনার আর কিছুই করার নেই। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিশ্চয়তার শিকলে বন্দি করার ক্ষমতাও আপনার নেই। আপনি শুধু বর্তমান সময়কে কাজে লাগাতে পারেন। এ জন্য কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, হজ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা আবশ্যক। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিলম্ব করার সুযোগ নেই। অতএব, যখনই হজের সামর্থ্য হবে তখনই হজ পালন করতে হবে। কারণ জীবন আপনার হাতে নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অতি দ্রুত (ফরয) হজ আদায় করে নাও; কারণ তোমাদের কারোরই জানা নেই যে, আগামীতে সে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।'[১]

যখন আপনার সম্মুখে সব পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে তখন স্মরণ করুন আল্লাহকে!

আপনার সামনে যদি কোনো দরজা খোলা থাকে, তাহলে আপনি কি কাউকে দরজাটা খুলে দিতে বলবেন? নিশ্চয় বলবেন না। তবে বন্ধ দরজা খুলে দেওয়ার জন্য আপনি কাউকে অনুরোধ করতে পারেন।

যখন আপনার সামনে সবকিছু সংকুচিত হতে শুরু করে, আপনার চাবি হারিয়ে যায়, ব্যাগ হারিয়ে যায় অথবা মূল্যবান কিছু হারিয়ে যায় এবং সামনের পথগুলো রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করুন। কারণ, একমাত্র তিনিই খুলে দিতে পারেন বন্ধ দুয়ার।

আমার এক বন্ধু তার জীবনের বাস্তব একটি ঘটনা শুনিয়েছে—

'লাতাকিয়াহ সমুদ্রবন্দরে জাহাজে করে আমার কিছু মালামাল আসে। সেগুলো খালাসের উদ্দেশ্যে আমি বন্দরে যাই। আমার সাথে ছিল পণ্য খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র-সহ একটি ব্রিফকেস। কিন্তু বন্দরে পৌঁছার পর যখন মাল খালাস করব, তখন আবিষ্কার করলাম, ব্রিফকেসটি আমার কাছে নেই। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে হলো রক্ত জমে হিম হয়ে গেছে। জাহাজে আমার এবং আমার বন্ধুদের মিলিয়ে কয়েক মিলিয়ন

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৭২১

রিয়ালের পণ্য মজুদ ছিল। কী করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলাম।

আমি গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনের অজান্তেই হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—'ইয়া ফাত্তাহ!' প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ সেখানেই নিথর দাঁড়িয়ে। মনে মনে অত্যন্ত বিনয় ও আকুতির সাথে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করি।

আমি যে গাড়িতে এসেছিলাম ব্রিফকেসটি সে গাড়িতে কি না মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কিছুই মনে পড়ল না। আল্লাহর কুদরতের কী অপার মহিমা! আচমকা একটা গাড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

গাড়ির ড্রাইভারকে বললাম, 'এখন আমি কোথাও যাব না। আপনি চলে যান।' ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘণ্টাখানেক আগে আপনি আমার গাড়িতে এসেছেন। এই ব্রিফকেসটি বোধহয় আপনার!'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, এটাই তো আমার ব্রিফকেস! এক ঘণ্টা ধরে তো এটাই আমি খুঁজছি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

আল্লাহর নাম নিয়ে দুআ করার বদৌলতে সে হারানো ব্রিফকেস ফিরে পেয়েছে। আমার বন্ধু ও গাড়ির ড্রাইভার দুজনই আল্লাহর বান্দা। যখন সে গাড়ির কথা মনে করার চেষ্টা করেছে, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা গাড়ির ড্রাইভারকে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন! তার মনে যাত্রী ভাইয়ের প্রতি কল্যাণকামিতা, সহমর্মিতা এবং আল্লাহর ভয় উদ্রেক করে দিয়েছেন। তাই সে দ্রুত ব্রিফকেস-মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

আপনি করুণার দ্বার উন্মোচনকারী আল-ফাত্তাহর ওপর ঈমান এনেছেন। তাই যখনই আপনার সামনে কোনো দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, তখনই গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি, আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে ঈমানের সাথে ডাকুন—'ইয়া ফাত্তাহ'[১]। ইনশাআল্লাহ, তিনি আপনার পথ খুলে দেবেন।

---

[১] যেকোনো ধরনের সংকট থেকে উত্তরণের জন্য 'ইয়া ফাত্তাহ' পড়া যেতে পারে। এর দ্বারা আশা করা যায়, আল্লাহ সংকট দূর করে দেবেন। তবে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়াকে উত্তম কিংবা সুন্নাহ মনে করা অথবা অভিনব কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা বিদআত। যেমন : আমাদের দেশের অনেক স্থানেই বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট-সংখ্যক বার 'ইয়া ফাত্তাহ' পড়া হয় যা সুস্পষ্ট বিদআত।

তিনিই খুলে দেন আকাশের দরজা

মহামহিম আল্লাহ বলেন—

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

অতঃপর প্রবল বারি বর্ষণে আমি আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। আর মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে।[১]

আকাশের দরজা বন্ধ থাকে। যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তখন আল্লাহ তাআলাই তা খুলে দেন। আপনি প্রায়ই সংবাদে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে শুনতে পাবেন, প্রবল বৃষ্টিপাত ও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। কখনো বলা হয়, সেপ্টেম্বরের প্রথম শুক্রবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এক জুমআ, দুই জুমআ, তিন জুমআ এভাবে অক্টোবর, নভেম্বর পার হয়ে যায় কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধও পাওয়া যায় না।

বৃষ্টি বর্ষণের কথা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। কারণ আকাশ থাকে তালাবন্ধ। আল্লাহর কাছেই সেটার চাবিকাঠি।

কেউ যুদ্ধে জয়ী হলো। বিজিত অঞ্চল পূর্ব থেকেই তালাবন্ধ ছিল। দুর্গ, মজবুত প্রাচীর, নিরাপত্তা বেষ্টনি ইত্যাদি নানা ব্যবস্থাপনায় তার দ্বারসমূহ ছিল রুদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ সে অঞ্চলের তালা খুলে দিয়েছেন। মুসলিমদের বিজয় দান করেছেন। সেটা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

তাই যিনি আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেন, বৃষ্টিতে ভরিয়ে দেন পৃথিবী, তিনিই আল-ফাত্তাহ। যিনি শক্তিশালী সৈন্যসামন্ত ঘেরা, মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত অঞ্চলের তালা খুলে দেন; সুদৃঢ় দুর্গের লৌহকপাট উন্মুক্ত করে দেন, তিনি আল-ফাত্তাহ।

যারা আল্লাহর মুমিন বান্দা, যাদের হৃদয় ঈমানের আভায় উদ্ভাসিত এবং ঈমানের উচ্চ শিখরে উন্নীত, তাদের হৃদয়কে মহান আল্লাহ বিশেষভাবে উন্মোচিত করেন।

---

[১] সুরা ক্বামার, আয়াত : ১১-১২

আল্লাহ তাদের অন্তরে প্রদীপ জ্বেলে দেন। সেই উজ্জ্বল আলোয় তারা তখন হক-বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজন-রেখা দেখতে সক্ষম হন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হৃদয়ে অন্তর্দৃষ্টির মশাল জ্বেলে দিয়েছিলেন। সুমহান আল্লাহ বলেন—

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝

এভাবে আমি ইবরাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

সবসময় অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না আপনি। তবু মাঝে মাঝে হৃদয়রাজ্যে সুস্পষ্ট আলোকরেখা দেখতে পাবেন। যে মনে করে ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেই সফলতা; পার্থিব জীবনে সম্মানিত হওয়াই আভিজাত্য ও মহানুভবতা, সে আসলে অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত, হৃদয় তার তালাবন্ধ। আল্লাহ যদি আপনার হৃদয় জগৎকে আলোকিত করে দেন, অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেন, তাহলে অন্তর হয়ে যাবে একটি স্বচ্ছ আয়না। তাতে আপনি সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সবকিছু দেখতে পাবেন; ঠিক আয়নায় আপনার চেহারা দেখার মতোই।

আলিমগণ বলে থাকেন, আল-ফাত্তাহ এমন মহান সত্তার নাম, যিনি অন্তর্দৃষ্টির নুরে উদ্ভাসিত করেন মুমিনদের অন্তর। আল-ফাত্তাহ এমন সত্তার নাম যিনি গুনাহগারদের জন্য খুলে দেন মাগফিরাতের দুয়ার।

নিশ্চয় আপনি এখন পাঁচ বছর আগের চেয়ে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন; মূল্যবোধে অধিক উন্নত। এভাবেই আল্লাহ আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে দিনদিন বৃদ্ধি করতে থাকেন। এ জন্যই মুমিনদের ঈমানি অবস্থার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় অনেক তারতম্য। কত মুমিন রয়েছে আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও দিনের বড় একটা অংশ উদাসীনতা আর অবহেলায় কাটিয়ে দেয়। এর বিপরীতে অনেক মুমিন রয়েছে, যাদের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে কেটে যায়। আল্লাহ প্রদত্ত আলোয় ঝলমল করে ওঠে তাদের অন্তর্লোক।

মাঝে মাঝে মানুষ একটি বই একবার পড়ে কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু কিছুদিন পর আবার যখন পড়ে, তখন সে বুঝতে শুরু করে। কিতাবের গভীরে বিচরণ করে,

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৭৫

মুখস্থ করে এবং বিষয়বস্তু অন্যদের সামনে উপস্থাপনও করে। তখন আল্লাহ তার বক্তব্যে প্রজ্ঞা দান করেন যাতে অসংখ্য মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়।

দ্বীনের ক্ষেত্রে ইলমের দৌলত দান করে আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর অনুগ্রহের দ্বার উন্মোচন করেন। আবার একইভাবে দুনিয়াবি দিক দিয়েও তিনি বান্দার সমস্যা নিরসন করে দেন।

আপনি অভাবগ্রস্ত হলে তিনি আপনাকে অভাবমুক্ত করেন, আপনি দুর্বল হলে তিনি আপনাকে শক্তিশালী করেন, অত্যাচারের শিকার হলে শত্রুদের বিপক্ষে আপনাকে সাহায্য করেন, আপনি বিপদগ্রস্ত হলে তিনি এই বিপদ দূর করে দেন এবং তার স্থানে প্রশান্তি, তৃপ্তি দিয়ে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করেন। তাই মানুষ আল্লাহর থেকে দূরে সরে গেলে কখনোই সফলকাম হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ۝١٢٤

যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত। আর আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।[১]

শত শত, হাজার হাজার, কোটি কোটি অর্থের মালিক, সীমাহীন শক্তি ও দাপটের অধিকারী কত দুনিয়াদার রয়েছে। আমি আপনাকে আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি তাদেরকে তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখুন। কী ভয়ানক অস্বস্তি আর সংকীর্ণতার মধ্যে তাদের জীবন কাটে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তো বলেও ফেলে, 'আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভাগা!'

আল্লাহ আপনার অন্তরে প্রশান্তির ফল্গুধারা বর্ষণ করেন। আপনার হৃদয়ে তাঁর সন্তুষ্টির বন্ধ দুয়ার খুলে দেন। অন্তর্লোকে সদা সর্বদা তখন আপনি আল্লাহর সান্নিধ্য অনুভব করেন। সংকীর্ণ বাড়িতে, ভাঙা ঘরে থেকেও আপনি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, তৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ। নিজেকে মনে করেন সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান। এর বিপরীতে ১০ কাঠা জমির ওপর নির্মিত বিশাল বাড়িতে থেকেও অনেকে হা-হুতাশ করতে থাকে।

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১২৪

প্রায়ই আপনি তাদেরকে এমনটা বলতে শুনবেন, আজ মার্কেটের অবস্থা একদম শোচনীয় বা এই বছর এত মিলিয়নের লোকসান হয়েছে!

তিনিই খুলে দেন তাওফিকের দুয়ার

এই পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহর তাওফিক ছাড়া হতে পারে না। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাকাশযানের নাম 'চ্যালেঞ্জার'। এটি আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিল, ৯ মাস বা এক বছরের মধ্যে সাতজন নভোচারী সদস্য মহাশূন্যে ঘুরে আসবে। ফলে উড্ডয়ন-অবতরণের মাধ্যমে অতিসূক্ষ্মভাবে চ্যালেঞ্জারকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। মহাকাশযাত্রার সকল আয়োজন সম্পন্ন। এরপরও মহাকাশযানটি আকাশে উড়ানোর মাত্র ৭৩ সেকেন্ডের মাথায় পরিণত হলো একটি অগ্নিপিণ্ডে। কুণ্ডলি পাকানো মারাত্মক ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি সেদিন। প্রাণ হারিয়েছিল নভোচারীদের সাতজনই।

তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং পার্থিব সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করলেও আল্লাহর তাওফিক তাদের সাথে ছিল না, তাই তারা ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য সবসময়ই আমাদের নিচের দুআটি বেশি বেশি পড়ার বিকল্প নেই। দুআটি হলো সুরা হুদ-এর ৮৮ নং আয়াত—

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই; তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি, তাঁর প্রতিই নিবিষ্ট হই।

আপনি কোনো ফ্যাক্টরির ভিত্তিস্থাপন করুন, কোনো বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করুন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করুন কিংবা বিবাহের সংকল্প করুন, সকল ক্ষেত্রেই গভীর আবেগ, বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে ডাকুন, 'ইয়া ফাত্তাহ।' কখনো মনে করবেন না, আপনি অনেক বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান; আপনি আপনার সবটুকু বুদ্ধিমত্তা ব্যয় করে কাজে সফল হবেন। কখনো ভাববেন না, কোনো আইনজীবীর সাথে কথা বলে জয়ী হবেন। বরং আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হোন।

বুদ্ধিমত্তার ফল

একজন লোককে আমি চিনতাম। লোকটি গাড়ি, বাড়ি, কল-কারখানা-সহ প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক। কিন্তু জীবনের প্রতি তার অসম্ভব রকমের ক্ষোভ ও অসন্তোষ

ছিল। সবসময়ই সে বিরক্ত ও অস্থির থাকত। সে একবার অনেক হিসাব-নিকাশ করে বের করল যে, যদি সে তার ফ্যাক্টরি, বাড়ি এবং একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেয় তাহলে কয়েক কোটি টাকা তার হাতে চলে আসবে। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ইউরোপের কোনো ব্যাংকে রেখে দিলে যে মোটা অঙ্কের সুদ আসবে, তা দিয়ে কোনো ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়াই রাজার হালতে তার বাকি জীবন কেটে যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে তার পরিকল্পনা মোতাবেক গাড়ি, বাড়ি, ফ্যাক্টরি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সব বিক্রি করে দিলো। এরপর ইউরোপের অন্যতম উন্নত দেশ সুইডেনের ভিসা সংগ্রহ করে সেখানে পাড়ি জমাল।

পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক তার ইচ্ছা ছিল অর্থগুলো ব্যাংকে রেখে দেবে। সেখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে একটি বিলাসবহুল বাড়ি করবে, কিছু টাকা দিয়ে কিনবে একটি দৃষ্টিনন্দন গাড়ি। ব্যাংকে গচ্ছিত বাকি টাকার সুদ দিয়ে খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন উপভোগ করা যাবে। পরিকল্পনা সব তো ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু জটিলতা দেখা দিলো অন্য জায়গায়। এত বিশাল অঙ্কের টাকা একজনের নামে ব্যাংকে রাখতে গেলে নিরাপত্তাজনিত জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির একাউন্টে বেশ বড়সড় একটি এমাউন্ট জমা দিলো সে। কিন্তু যার একাউন্টে রেখেছিল, পরদিন থেকেই সে তাকে না চেনার ভান করতে লাগল। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! তিল তিল করে জমানো তার এতদিনের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ কয়েক মুহূর্তের মাঝেই হাতছাড়া হয়ে গেল, তাও আবার নিরাপত্তার স্বার্থেই।

প্রিয় পাঠক, এই ঘটনাটি আপনার অন্তরে গেঁথে রাখুন চিরকাল! মনে রাখবেন, আল্লাহর সাথে কোনো মেধা, বুদ্ধি বা বিচক্ষণতায় কাজ হয় না। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুই সফলতার মুখ দেখে না। আল্লাহর নির্ধারিত সীমার বাইরে আপনার সর্বোচ্চ সতর্কতা বা সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু যে বিপদ নেমে এসেছে বা যে বিপদ অনাগত—উভয় ক্ষেত্রেই দুআ অতি কার্যকরী ব্যবস্থা। তাই যেকোনো জটিল পরিস্থিতিতে শুধু আল্লাহর দিকেই নিবিষ্ট হোন! সেই সাথে দুআ করুন—

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই; তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি, তাঁর প্রতিই নিবিষ্ট হই।

মহান আল্লাহর নাম আল-ফাত্তাহ থেকে দুটি শিক্ষা গ্রহণ করুন—

এক. সর্বদা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে মগ্ন থাকুন; তিনি আপনার হৃদয়ে ইলম ও জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেবেন।

দুই. আপনি আপনার দান-অনুদান এবং বদান্যতা ও অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিন আল্লাহর বান্দাদের জন্য। আপনার দানের হাত সম্প্রসারিত করুন; দান-সাদাকা থেকে কখনো গুটিয়ে ফেলবেন না। কারণ বান্দার হাত সম্প্রসারিত করাকে আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেন।

আল-ওয়াহহাব : اَلْوَهَّابُ

উদার দানশীল, পরম মমতাময়

সন্ধ্যা হয়ে এলেই ঘরে ঘরে বাতি জ্বালানো হয়। এর জন্য মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিলও দিই আমরা। অথচ দিনের বেলা সূর্য বিনামূল্যে আলোর জোগান দিয়ে যাচ্ছে। কখনো কি ভেবেছি সূর্যের আলো পাওয়ার জন্যও যদি প্রতি মাসে কয়েক হাজার টাকা করে বিল পরিশোধ করতে হতো, তাহলে কত ভয়ানক হতো আমাদের অবস্থা! পরম দাতা ও প্রেমময় আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে সেই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটিই সকলের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে জানা যায়, সূর্যের স্থায়িত্ব এখনো আরো পাঁচ বিলিয়ন বছর।[১] অতএব, সূর্যের আলো নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, আলহামদুলিল্লাহ। তিনিই আল-ওয়াহহাব যিনি বান্দাদের জন্য এমন বিশাল ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছেন।

☆☆☆

আল্লাহর আল-ওয়াহহাব নামের মাঝে পরম দানশীলতার পাশাপাশি লুকিয়ে আছে পরম মমত্ববোধ। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেও তিনি এই গুণ দান করেছেন।

ইসলাম কেবল কিছু সূক্ষ্ম-জ্ঞান ও গূঢ় তথ্য জানার নাম নয়; ইসলাম হলো কিছু সত্য অনুভূতি এবং বিশ্বাসের নাম। যেখানে মানব-মস্তিষ্ক আল্লাহর অস্তিত্ব, মহত্ত্ব

---

[১] প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ও তাঁর উত্তম গুণবাচক নামসমূহের বাস্তব উপলব্ধির পাশাপাশি তা হৃদয়-আত্মায় ধারণ করবে। হৃদয় থাকবে আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসায় টইটম্বুর।

দেখুন, মানুষকে তার বিবেক ও মস্তিষ্কের তুলনায় ভালোবাসাই বেশি আলোড়িত করে; তার মধ্যে রোমাঞ্চ ও শিহরণ জাগায়। ভালোবাসার জন্য মানুষ জীবনের দামি-সস্তা সবই ব্যয় করতে পারে; এমনকি উৎসর্গ করতে পারে তার সবচেয়ে মূল্যবান জীবনটাকেও। কিন্তু নিছক বিবেক ও মস্তিষ্কের বিচারে সে আলোড়িত হয় না; এর দ্বারা সে হয়তো বিশ্বাসে উপনীত হয়, তৃপ্ত হয়, নিরস কিছু উপলব্ধিতে জাগ্রত হয়; কিন্তু আবেগ না থাকায় শিহরিত হয় না।

তাই যারা আল্লাহর পথের দাঈ, তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হলো, একই মুহূর্তে বিবেক ও হৃদয় উভয়কে জাগানো। বিবেক ও যুক্তির সাথে ভালোবাসা থাকলে পূর্ণাঙ্গ সফলতা পাওয়া সম্ভব।

আপনার মধ্যে বিবেক ও হৃদয়ের সহাবস্থান। জগৎ ও বিশ্বকে জানার জন্য যখন আপনি আপনার বিবেককে কাজে লাগাবেন, আপনি আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যাবেন। আর যখন আল্লাহর অসংখ্য ও অফুরন্ত নিয়ামত উপলব্ধি করবেন, আপনি তাঁকে ভালোবেসে ফেলবেন হৃদয় দিয়ে। আল্লাহকে ভালোবাসার দ্বারাই কেবল আপনি আপনার চিন্তাশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। আর তখনই আপনি হয়ে উঠবেন প্রকৃত মানুষ।

আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করবেন। সে উপলক্ষ্যে একটি বিদায়ী সভার আয়োজন করা হয়। সেদিন বিদায়ী বক্তব্যে তিনি একটা কথা বলেছিলেন, কথাটি আমি সারা জীবনেও ভুলতে পারব না। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের মধ্যে যদি প্রেমানুভূতি না থাকে, সে যদি কাউকে ভালোবাসতে আগ্রহ না পায় এবং কারো ভালোবাসার পাত্র হওয়ারও আকাঙ্ক্ষা না করে, তাহলে তাকে মানুষ বলা সম্ভব নয়।'

আপনার অন্তর যদি হয় রুক্ষ, পাষাণ এবং পাথরের মতো কঠিন, তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে নেই। আপনি আপনার হৃদয়ে প্রেমবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করুন।

সাহাবিদের সীরাত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাব, তারা দ্বীনের জন্য, আল্লাহর জন্য এবং নবিজির জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহর নবির জন্য তারা

এমন সব কুরবানি করেছেন, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যা অসম্ভব। আমাদের কারো যদি হাত কেটে যায় বা একটু ক্ষত হয় তাহলে সাথে সাথেই সে ব্যথায় চিৎকার করে উঠবে, অতি দ্রুত তা ব্যান্ডেজ করবে; চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে নেবে এবং কোনো সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম থাকলে তা বাতিল করে দেবে। এক কথায় সে অস্থির হয়ে সব কিছু ভুলে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু রাসুলুল্লাহর প্রিয় সাহাবি, চাচাতো ভাই জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখুন। মূতার যুদ্ধে তরবারির আঘাতে তার ডান হাত কেটে যায়। হাতের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে সাথে সাথেই তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা উঁচু করে রাখেন। আরেকটি আঘাতে তার বাম হাতটিও কেটে পড়ে যায়। সে দিকেও কোনো দৃষ্টি না দিয়ে কাটা দুহাতের ঊর্ধ্বাংশ দ্বারা আঁকড়ে ধরেন ইসলামের পতাকা। এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি এই যে প্রেম-ভালোবাসা এবং আত্মোৎসর্গ করার ব্যাকুলতা—এর উৎস আসলে কোথায়?

জাহিলি যুগের নারী কবি খানসা। পরবর্তীতে তিনি ইসলামের যুগও পেয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার ভাই সাখর নিহত হওয়ায় সারা দুনিয়াকে তিনি তার বিলাপ আর শোকতাপে ভারী করে তুলেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর সেই খানসার চার পুত্র একসাথে শহিদ হয়ে গেল কাদিসিয়ার যুদ্ধে। কিন্তু তার এবারের শোকের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপন ছেলেদের শাহাদাতের খবর শুনে তিনি কেবল এতটুকুই বলেছিলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাদের শহিদ করে আমাকে সম্মানিতা করেছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সাথে আমাকে একত্র করবেন তাঁর করুণার ঘর জান্নাতে।'

খুবাইব ইবনু আদি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মুশরিকরা বন্দি করে নিয়ে যায়। ঝুলিয়ে রাখে খেজুর গাছের কাঁটাযুক্ত ডালে। গাছের নিচে মুশরিকরা তির-ধনুক প্রস্তুত করছিল, মুহূর্তের মধ্যেই যা খুবাইবের কলিজা বিদ্ধ করে বেরিয়ে যাবে। এমন উপস্থিত মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায় মুশরিক নেতা আবু সুফইয়ান তাকে ডাকল, 'খুবাইব! তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে তির বিদ্ধ করাটা তুমি পছন্দ করবে?'

খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী-সন্তান এবং পরিবারের লোকদের সাথে আরাম-আয়েশে থাকব আর অন্যদিকে রাসুলুল্লাহর

গায়ে কাঁটা বিঁধবে—এটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'[১]

সাহাবিদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করুন, আপনি হতভম্ব হয়ে যাবেন। তাদের জীবনেতিহাস পাঠ করুন, আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

যারাই আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আত্মোৎসর্গ করে; যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার সামনে ইচ্ছার লাগাম টেনে ধরে এবং আল্লাহর রাস্তায় অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে—কীসে তাদেরকে উৎসাহিত করে এমন দুঃসাহসিক অভিসারে? নিশ্চয় বিবেক-বুদ্ধির কাছে এর জবাব নেই। এমন অসম্ভব পদক্ষেপকে বাস্তবে রূপ দিতে তাদের যে জিনিস আন্দোলিত করে তা হলো ভালোবাসা। ভালোবাসাই মানুষকে সৌভাগ্যের আসনে সমাসীন করে। তাই আল্লাহকে ভালোবাসুন। দুনিয়ার কেউ তার দরজা সবসময় আপনার জন্য খুলে রাখবে না। কিন্তু আল্লাহর দুয়ার সদা-সর্বদা সবার জন্যই অবারিত, উন্মুক্ত। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন খুবই সহজ। তাঁর হৃদয় অনুগ্রহ-মমতায় পূর্ণ। তাঁর দান-প্রতিদান অসীম।

আপনি যদি আল্লাহর আল-ওয়াহহাব নামটি নিয়ে আপনার ফিতরাত দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তাহলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, প্রতিটি মানুষের হৃদয়-আত্মা আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ থাকা অপরিহার্য। আপনার হৃদয়-আত্মা যখন আল্লাহর প্রেমে টইটম্বুর হবে তখন আপনি নিজের ভেতরে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ঝলক অনুভব করবেন। আপনার মনে জাগ্রত হবে স্রষ্টার প্রতি পরম ভক্তি, পেয়ে যাবেন সরল পথের দিশা। আপনি উন্নীত হবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকপ্রাপ্তির উচ্চ শিখরে।

মুমিনের হৃদয়ের ব্যাকুলতার কারণ তার অন্তর্নিহিত ঈমান। তাই যখনই আল্লাহর আলোচনা হয় তখনই মুমিনের অন্তর পুলকিত হয়, কেঁপে ওঠে। আল্লাহ বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

নিশ্চয় মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।[২]

[১] *সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবাহ* : ১৩

[২] সুরা আনফাল, আয়াত : ২

অন্তর প্রকম্পিত হওয়া, শিহরিত হওয়া—এগুলো ঈমানের আত্মিক লক্ষণ। মানুষের জীবনে ভালোবাসার দাবিদার ও ভালোবাসার কার্যকারণ তো একাধিক হতে পারে। তাহলে বাস্তবে সে কাকে ভালোবাসবে? কার ভালোবাসার সামনে সে আরেকজনের চাহিদা আর আবদারকে বিসর্জন দেবে? এক্ষেত্রে শুধু আবেগ বা মৌখিক দাবি যথেষ্ট নয়। তাই যখন হৃদয়ে ভালোবাসার দাবি বেশি হয়ে যায় তখন আল্লাহ সত্য ভালোবাসাকে যাচাই করেন এবং রীতিমতো দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে আদেশ করেন। সুমহান আল্লাহ বলেন—

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

বলুন, (হে নবি!) যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমাকে ভালোবাসো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

অতএব, আমাদের মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা আছে কি না, তার প্রমাণ হলো—আমরা রাসুলুল্লাহর আনুগত্য করি কি না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যেসব কাজের ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকছি কি না।

কৃতজ্ঞ হোন মমতাময় রবের প্রতি

আমরা সদা মহান আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত উপভোগ করি। কোনো মূল্য বা পারিশ্রমিক দেওয়া ছাড়াই আমরা এ সকল নিয়ামত পেয়ে যাই, তাই এগুলোর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সময় হয়ে ওঠে না।

মনে করুন আপনি পাবলিক বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন। গাড়িতে উঠতেই দেখা গেল আপনার একজন বন্ধু। ভাড়া পরিশোধের সময় সে নিজের পকেট থেকেই টাকা বের করে আপনার ভাড়া দিয়ে দিলো। আপনি তখন কী করবেন? নিশ্চয় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। তার অনুগ্রহে খুশি হবেন। কেউ যদি আপনাকে একটু হাদিয়া দেয় আপনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। সে কবে আপনার সাথে দেখা করবে, কবে আপনার বাসায় বেড়াতে

[১] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৩১

আসবে—সেটা জিজ্ঞেস করতেও বাকি রাখেন না। আসলে মানবাত্মা এমনই, এভাবেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কাফিররা দুনিয়াবি নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই মজে থাকে কিন্তু এর পেছনে কে আছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ মুমিন এই পার্থিব নিয়ামতের গভীরে ঢুকে আবিষ্কার করে এক সত্তাকে। নিয়ামতের পথ ধরে সে পৌঁছে যায় নিয়ামত-দাতার সান্নিধ্যে।

আপনার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল। আপনি একজনের অতিথি হলেন। খাবারের টেবিলে সারি সারি সাজানো দেখলেন বিভিন্ন পদের খাবার। শেষ পর্বে রয়েছে মিষ্টি, ফলমূল, ঠান্ডা কোমল পানীয় এবং আইসক্রিম।

ক্ষুধার তাড়নায় গোগ্রাসে খেতে থাকলেন, খেয়ে তৃপ্ত হলেন। ক্ষুধাগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেল।

খাওয়া শেষে অবশ্যই আপনি তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। খাবারের শেষে তার জন্য হয়তো দুআ করবেন—

'আপনার খাবার সবসময় যেন সৎ লোকেরাই খায়।'

'আল্লাহ আপনার নিয়ামতকে স্থায়ী করে দিন।'

'আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন।'

'আল্লাহ আপনার মর্যাদা স্থায়ী করুন এবং আপনাকে বারাকাহ দান করুন।'

এভাবে তার আপ্যায়নে আপ্লুত হয়ে বিভিন্ন উত্তম দুআ দ্বারা আপনি তার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে থাকেন।

একজন মানুষের অনুগ্রহ বা সদয় আচরণ পেয়ে আপনি বিগলিত হন, তাহলে আল্লাহ যখন তাঁর অসংখ্য নিয়ামতরাজি দ্বারা আপনার জীবন ভরিয়ে দেন, তখন কীভাবে ভুলে যান সেই রবকে? কীভাবে ভুলে যান তাঁর শুকরিয়া আদায়ের কথা?

আল্লাহ বলেন, 'আমি কি তোমাকে দুটি চোখ দান করিনি?'[১]

---

[১] সুরা বালাদ, আয়াত : ৮

আল্লাহ আপনাকে যে মহামূল্যবান দুটি চোখ দিয়েছেন তা দিয়ে দিব্যি আপনি দুনিয়ার সবকিছু দেখছেন। আধো আধো বোল ফোটা সন্তানের মুখ দেখছেন, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখছেন। গাছপালা, বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এবং ফুল-ফসল কত কিছুই দেখছেন। প্রাকৃতিক মনোরম অনেক রঙিন দৃশ্য অবলোকন করে মুগ্ধ হচ্ছেন। রাস্তায় দেখে চলছেন, হাতে বই নিয়ে চোখ বুলাচ্ছেন, হৃদয়ঙ্গম করছেন তার মর্ম। এভাবে দৃষ্টিশক্তির নিয়ামত ভোগ করছেন অহর্নিশ। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহেই আপনাকে দান করেছেন এই মহা-নিয়ামত।

একবার ঘরের কিছু ফার্নিচার বার্নিশ করানোর জন্য একজন বার্নিশ-মিস্ত্রির কাছে গেলাম। তার সাথে কথা বলতে গেলে তিনি আমাকে তার সহযোগীর সাথে কথা বলার ইশারা করলেন। আমি সহযোগীর সাথে কথা বললাম। কথা শেষ হওয়ার পর দেখি তারা একজন অপরজনের সাথে আকার-ইঙ্গিতে কথা বলছে, কারণ বার্নিশ-মিস্ত্রি ছিলেন বোবা। এটা আমার জন্য একদম নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম, আল্লাহ তাআলা বাকশক্তির কী মহা-নিয়ামত আমাদের দান করেছেন!

মহামহিম আল্লাহ বলেন, ‘(হে মানুষ!) আমি কি তোমাকে দুটো চোখ দিইনি? সেই সাথে জিহ্বা ও দুই ঠোঁট? আমি কি তোমাকে দুই পথের (পাপ ও পুণ্যের) দিশা দিইনি?[১]

দু-চোখের মতো আল্লাহ আমাদের দান করেছেন জিহ্বা। এই জিহ্বা দ্বারা আপনি মনের ভাব প্রকাশ করেন। নিজের আনন্দ-খুশি, সুখ-দুঃখ এবং অনুভব-অনুভূতি ব্যক্ত করেন। জনসম্মুখে কুরআনের তাফসির পেশ করেন। চমৎকার কোনো গল্প শোনান। স্বজন, প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথাবার্তা বলেন। এক জিহ্বার দ্বারাই আপনার জীবনের এতগুলো প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

রাশিয়ার বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইভান পেট্রোভিচ পাভলোভ মনোবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

ইভানের কাজ মূলত রিফ্লেক্স সিস্টেমের[২] ওপর ছিল। পরবর্তী উদাহরণও

---

[১] সুরা বালাদ, আয়াত : ৮-১০

[২] রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার এই তত্ত্বটি বাইরের কিছুর সংস্পর্শে জীবের প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

রিফ্লেক্সকে বোঝাচ্ছে।

ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে মনোবিজ্ঞানের ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম, নবজাতক শিশুরা একটির বেশি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে না। আপনি যদি তার সামনে জ্বলন্ত কয়লা দেন, তাহলে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই সে তাতে হাত ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু স্নায়ুতন্তু যখনই তাপ উপলব্ধি করবে, তখন আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে শিশুটি হাত বের করে ফেলবে। এ ক্ষেত্রে সে মস্তিষ্ক থেকে সংকেত লাভ করবে না বরং স্নায়ুর উপলব্ধিই তাকে হাত বের করে ফেলতে বাধ্য করবে। কিন্তু এই বাচ্চাটিই যখন বড় হবে তখন তার মস্তিষ্কই তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

মানুষের মধ্যে এই অভিযোজন প্রক্রিয়া না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না।

মানব মস্তিষ্কের ধারাবাহিক উন্নতি ও বিকাশ নিয়ে চিন্তা করলে হতবাক হতে হয়। আল্লাহর দানের কী অপার মহিমা লুকিয়ে আছে মানবদেহের এই অংশে।

ছোট্ট শিশু যখন কিছুটা ভাবনা-কল্পনার উপযুক্ত হয়, তখন হয়তো যেকোনো পুরুষকেই আব্বু বলে ডাকে। একটু বড় হবার পর ডাক পরিবর্তন হয়, যাকে দেখে তাকেই বলতে থাকে চাচ্চু। তার মস্তিষ্কে শুধু আব্বু এবং চাচ্চুর মর্মটুকুই প্রবেশ করেছে; কিছুদিনের জন্য সবাইকে আব্বু এবং কিছু দিনের জন্য সবাইকে চাচ্চু মনে হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই সে আব্বু ও চাচ্চুর মাঝে বিভাজন রেখা আবিষ্কার করে ফেলে।

এভাবে যখন তার সামনে গাছের নাম উল্লেখ করা হয়, তখন তার কচি মস্তিষ্কে গাছের ছবি খেলে যায়। ঘরের পাশে বা রাস্তার ধারে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষগুলোকে সে শুধু গাছ হিসেবে চেনে। কিন্তু এক গাছের সাথে আরেক গাছের কী পার্থক্য তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। আস্তে আস্তে মেধার বিকাশ ঘটে, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সে শিখতে শুরু করে। এমনি করে সেই শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগপর্যন্ত মানব-মস্তিষ্ক যতগুলো স্তর পাড়ি দেয় তা এক অনাবিষ্কৃত বিস্ময়। মানব-মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতি ও বিকাশ একটি স্বতন্ত্র জগৎ। যে জগতে মহান আল্লাহর অসীম কুদরত লুকিয়ে আছে, যা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সারা দেহের অসংখ্য নিয়ামতের পাশাপাশি এক মস্তিষ্কেই আল্লাহ তাআলা এমন অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন, যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে গেলে

মহান রবের সামনে মস্তক নুয়ে পড়া ছাড়া কোনো পথ নেই। মুমিন আর কাফিরের পার্থক্য এই যে কাফির নিয়ামত উপভোগ করলেও উৎস নিয়ে কখনো চিন্তাভাবনা করে না। আর মুমিন যেকোনো নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মূল উৎস খুঁজে বের করে। নিয়ামতের পথ ধরেই সে নিয়ামতদাতার সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়।

আপনি সারাদিন অফিসে, কর্মস্থলে বা ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত। দিন শেষে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরলেন। বাসায় এসে দেখলেন আপনার কল্যাণময়ী স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে আপনার অপেক্ষায়। আপনার জন্য একরাশ সহানুভূতি, আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে, ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা ফুটিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, 'আসসালামু আলাইকুম।' ঘর-দোর সবকিছু পরিপাটি, খাবার টেবিলে প্রস্তুত করা খাবার দেখে হয়তো আপনার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। এমন চক্ষুশীতলকারী জীবনসঙ্গিনী পেয়ে নিজেকে অবশ্যই আপনি সৌভাগ্যবান মনে করবেন, এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার। আল্লাহ তাআলাই এমন কল্যাণময়ী নারীকে পাঠিয়েছেন আপনার জীবনসঙ্গিনী করে। তাই প্রিয়তমার মিষ্টি হাসির পিছনে যে মহান কুদরত মুচকি হাসছে তাকে ভুলে যাবেন না।

তবে আমরা গাফিল, আমরা আত্মভোলা উদাসীন। তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অতলে হারিয়ে যাই। ভাবতে থাকি, 'নিশ্চয় আমার শ্রম ও বিচক্ষণতার জন্যই তাকে পেয়েছি; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রাত দিন এক করে উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করেছি; মোটা অঙ্কের মোহর জমিয়েছি। অতএব, আমার যা কিছু প্রাপ্তি তা আমার শ্রমের ফল।'

এই ধারণা নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক। যে জিনিস আল্লাহ আপন অনুগ্রহে আপনার জন্য উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন, সেটা আপনি ভেবে নিয়েছেন নিজের উপার্জন। আর ভুলে গেছেন সেই মহান সত্তাকে!

আপনার ছোট্ট সোনামণির কথা চিন্তা করুন। সারাক্ষণ সে পুরো বাড়ি মাতিয়ে রাখে, আনন্দ-খুশিতে ভরিয়ে তোলে। এত মধুর অঙ্গভঙ্গি আর কী সুন্দর কোমল ও কচি একটি মন! কত সহজ-সরল আর নিষ্পাপ!

ছোট্ট শিশুর সরলতা ও কোমলতার প্রতি লক্ষ করুন। আপনি তাকে ধমক দিলেন, তিরস্কার করলেন। একটু পরেই দেখবেন, সে আপনাকে জড়িয়ে ধরছে, আপনার গালে চুমো দিচ্ছে। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা পরম সুন্দর ও কোমল একটি হৃদয়

দিয়েছেন। নিষ্পাপ ও পবিত্র একটি চাহনি দিয়েছেন। শিশুর কোমল হৃদয়ে আল্লাহ ঢেলে দিয়েছেন তার বাবা-মায়ের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। তার নিষ্পাপ চাহনিতে রেখেছেন এমন ভালো লাগা যা তার পিতা-মাতাকে বিমোহিত করে।

আমরা যখন আল্লাহর নাম আল-ওয়াহহাব নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমাদের চারপাশে আল্লাহপ্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামত দেখতে পাই। তবে নিয়ামত চোখে দেখলেও আমরা জেগে উঠি না। অথচ আল্লাহর অনুগ্রহ অবলোকন করলে সাথে সাথেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

পরম মমতাময়ের পরম দান

দান-অনুদানের পরিমাণ যত বেশি হয়, উপহার-উপঢৌকনের মান যত উন্নত হয়, দাতাকে তত সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়। কারো দান যদি হয় দৈনন্দিন, বৈচিত্র্যময় এবং অসীম—এমন মহৎ সত্তার জন্য শুধু 'দানশীল' ভূষণ বেমানান, তিনি মহাদাতা।

আপনার আত্মাকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ আমাদের কী দিয়েছেন? আপনার অন্তর্লোক থেকেই উত্তর বেরিয়ে আসবে। সর্বপ্রথম যে নিয়ামত আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন তা আপনার অস্তিত্ব। আজ পৃথিবী নামক এই গ্রহের আপনি একজন বাসিন্দা। কোনো এক শহরের, কোনো এক গলির, কোনো একটি বাসা আপনার। আপনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বলাভ করেছেন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তার আলো-বাতাস গ্রহণ করেছেন, প্রভাব সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছেন। আপনি পৃথিবীতে আপনার অস্তিত্ব এবং সুস্থতার নিয়ামত ভোগ করছেন। সুস্বাদু খাবার, পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছ থেকে লাভ করছেন আত্মিক প্রশান্তি ও অনাবিল সুখ। এসবই আল্লাহর বিশেষ দান।

পৃথিবীতে মানুষ ও জীব বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি হলো পানি। আল্লাহ তাআলা কী মহান নৈপুণ্যের মিশেলে সৃষ্টি করেছেন এই পানি। পানির কোনো রং নেই, স্বাদ নেই; নেই কোনো গন্ধ। আশ্চর্য ধরনের তারল্য দিয়ে আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। অতি সূক্ষ্ম লোমকূপের মধ্য দিয়েও তা চলাচল করতে পারে অনায়াসে।

পানির স্বাদ যদি মিষ্টি হতো তাহলে আমাদের সব ধরনের খাবার মিষ্টি হয়ে যেত। আল্লাহ যদি পানিকে চটচটে এবং আঠালো করে তৈরি করতেন, তাহলে আমরা

কী দিয়ে আমাদের কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতাম? আল্লাহর অসীম করুণা! তিনি পানি সৃষ্টি করেছেন কোনোরূপ স্বাদ, গন্ধ বা রং ছাড়াই! যেন জীবনের যেকোনো প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায় ঝামেলা ছাড়াই। সাধারণ অবস্থায় ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করলে পানি বাষ্পে পরিণত হয়। তাই রান্না করার সময় যদি ৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চুলা জালানো হয়, তাহলে সব খাবার পুড়ে যাবে। পানি বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য আল্লাহ যে তাপমাত্রা নির্ধারণ করেছেন, যদি এর চেয়ে বেশি করতেন তাহলে আমরা অনেক সংকটে পড়ে যেতাম। শীতকালে ঘর-দোর পরিষ্কার করার জন্য পানি ঢাললে তা শুকাতে গরমকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু আল্লাহ উপযুক্ত তাপমাত্রায় তা বাষ্পে পরিণত করেন। তাই আপনি যদি মেঝেতে এক গ্লাস পানি ঢেলে দেন, দেখবেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তা বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঝে শুকিয়ে গেছে। পানির এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহর মহাদান এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দলিল।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করেছেন। আপনার কর্ণকুহরে যে আওয়াজই প্রবেশ করছে, তা আপনি শুনতে পাচ্ছেন। তার ভাব-মর্ম উপলব্ধি করছেন। এমনকি মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় কোনটা কার কণ্ঠ, একজনের কণ্ঠের সাথে আরেকজনের কণ্ঠের কী পার্থক্য—তা-ও আপনি শব্দ শুনেই বুঝতে পারছেন। আপনার দৃষ্টির আড়ালে কিন্তু শ্রবণসীমার মধ্যে যখন কাচের গ্লাস পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখন কেবল শব্দ শুনতেই আপনি চমকে যাচ্ছেন, কেঁপে উঠছেন। আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে এই আশ্চর্য শক্তি যিনি দান করেছেন, তিনি পরম দাতা আল-ওয়াহহাব।

আপনি দৈনন্দিন সুস্বাদু বাহারি কত খাবার গ্রহণ করছেন! কী মনকাড়া চমৎকার সব ঘ্রাণ। পোলাও, বিরিয়ানি, মাংসের কত বাহারি সুবাস। যদি এসব সুস্বাদু খাবারগুলোর ঘ্রাণ দুর্গন্ধযুক্ত হতো তাহলে কেমন হতো? রান্না করা মাংস পচে গেলে কী দুর্গন্ধই না বের হয়! খাদ্যদ্রব্য ও সুস্বাদু খাবারগুলোতে যদি এমন দুর্গন্ধ হতো, তাহলে কি কখনো তা খাওয়া সম্ভব হতো? কিন্তু মহান আল্লাহ আপন অসীম প্রজ্ঞা ও সৃষ্টির প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার কারণে উত্তম খাবারগুলোতে দান করেছেন সুঘ্রাণ। আর অখাদ্য, কুখাদ্যে এবং পচা-বাসি খাবারে দিয়েছেন দুর্গন্ধ।

প্রবহমান মনোরম বায়ু তিনিই পরিচালনা করেন। বাতাসের স্পর্শে মানুষ হৃদয়ের শীতলতা অনুভব করে। সতেজতায় ভরে যায় তার দেহ-মন। আবার কখনো

আবহাওয়া পরিবর্তন হয়, বাতাসে ধূলি-কণা বা ময়লা-আবর্জনার সংমিশ্রণ থাকে, দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস প্রবাহিত হয় তখন মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে যায়। পরিচ্ছন্ন, নির্মল বায়ু আল্লাহর মহাদান।

মানুষ, জীব-জন্তু, প্রাণী ও সবুজ তরুলতার জন্য আল্লাহ তাআলা পানির প্রবাহ এবং তা সংরক্ষণের চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। পানি-সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তারা রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠত। এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি বৃষ্টি-সঞ্চারী বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। আর তোমরা এর সংরক্ষণকারী নও।'[১]

একবার আমি পানি সংরক্ষণের হিসাব কষতে গিয়ে যারপরনাই অবাক হয়েছি। গবেষণায় উঠে এসেছে, কেউ যদি এক বছরের জন্য প্রয়োজনীয় পানিটুকু সংরক্ষণ করতে চায়, তাহলে তার বাসভবনের সমপরিমাণ জায়গা নিয়ে পানি সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ আপনার বাড়ি যদি ৮০০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের হয়, তাহলে এক বছরের পানি সংরক্ষণের জন্য ৮০০ ঘনমিটার আয়তনের পানি মজুদ করতে হবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন, 'আর তোমরা পানির সংরক্ষণকারী নও।'

পর্বত থেকে নেমে আসা ঝরনাধারা এবং তা থেকে সৃষ্ট নদ-নদীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পানির ভার রক্ষণের যে বিশাল ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছেন তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। কিন্তু মহান আল্লাহর জন্য তা কঠিন কিছু নয়। তিনি মহান স্রষ্টা। সৃষ্টির প্রতি মমতাময়, উদার ও দানশীল; আল-ওয়াহহাব।

যিনি দান করেন বিনিময় ছাড়া

আপনাকে কেউ বলল, আমি তোমাকে এই বইটি উপহার দিলাম একশো টাকার বিনিময়ে। সে এখানে উপহার শব্দ ব্যবহার করলেও বাস্তবে ও শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা বিক্রয়। শুধু শব্দের কারণে বাস্তবতা পরিবর্তন হবে না।

আরেকজন আপনাকে বলল, তোমার কাছে এই বইটি বিক্রি করলাম কোনো বিনিময় ছাড়াই। এটা উপহার। সে বিক্রি শব্দ ব্যবহার করলেও এটা উপহার। উপহার অথবা

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ২২

দান—এসব তখনই হতে পারে যখন তা হবে বিনিময় ছাড়া।

সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তরের ওপর সরকার কর আরোপ করে। জনগণ এই করের হাত থেকে বাঁচার জন্য 'প্রকাশ্যে উপহার এবং গোপনে মূল্য পরিশোধ' নীতিতে জমি ক্রয়-বিক্রয় শুরু করে। কিছু দিন যেতে না যেতেই সরকার চালাকিটা বুঝে ফেলে। তখন সরকার উপহারের মাধ্যমে মালিকানা স্থানান্তরের ওপরও কর আরোপ করে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এটা উপহার নয়; বিক্রয়। তার মানে উপহার বা দান তা-ই, যা বিনিময় ছাড়া করা হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যা কিছু দেন তা কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়াই প্রদান করেন। আল-ওয়াহহাব নামের শব্দমূলে রয়েছে 'হিবা'। আর হিবা হচ্ছে বিনিময় ছাড়া দান।

যিনি উপহার দেন নেককার সন্তান

এক ব্যক্তির কয়েকজন সন্তান আছে। একটি ছেলে নম্র, ভদ্র এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। বাবা যদি তার ব্যাপারে গর্ব করে বলে, 'আমি অনেক কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করেছি। অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে পড়াশোনা করিয়েছি। তাই ও আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে।' আপনি কী বলবেন? কথাটা ভুল না শুদ্ধ?

আমার দৃষ্টিতে সে ভুল বলেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমি তাকে (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম) দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নুহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান ও আইয়ুব; ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।[১]

অর্থাৎ কোনো বিনিময় ছাড়াই তিনি তাদেরকে দান করেছেন। বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন।

আপনি আপনার সন্তানের পিছনে একটু পরিশ্রম করেই ভেবে নিয়েছেন, সে আপনার পরিশ্রমের ফল। কিন্তু কত সন্তান এমনও রয়েছে যারা ওদের মা-বাবার চোখের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে, পরিবারে অশান্তি ডেকে আনছে। মা-বাবা যত

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৮৪

কিছুই বলুক বা যেভাবেই শাসন করুক না কেন, তারা কোনোভাবেই সোজা হতে রাজি না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনেক বড় বড় আলিম রয়েছেন, যারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন, অথচ তাদের সন্তানরাই কিনা বিপথে চলে গিয়েছে। আমি মসজিদে নববির একজন ইমাম সম্পর্কে শুনেছি, তার ছেলেটা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার সামনে ছেলের কথা উল্লেখ করলেই তিনি আর কান্না থামাতে পারতেন না।

তাহলে বোঝা গেল, এটা নিছক নিজ হাতে উপার্জন করে নেওয়ার বস্তু নয়। সফল বাবা হওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলাই দান করেন। সন্তান যদি নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা না করে, তবে যতই তার তত্ত্বাবধান করুন না কেন, সে বিপথগামী হবেই। তাই যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনুগত, শান্ত-শিষ্ট একটি সন্তান দান করেন, তাহলে গর্ব নয়; বরং কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করুন মহান রবের সামনে। আপনার কাছ থেকে কোনো ধরনের বিনিময় নেওয়া ছাড়াই আল্লাহ এটা দান করেন।

মানুষও মাঝে মাঝে পার্থিব বিনিময় ছাড়াই কাউকে কিছু দান করে। কিন্তু বস্তুগত ও বাহ্যিক কোনো বিনিময় না নিলেও সে অন্যভাবে প্রতিদানের আশা করে। সে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা-স্তুতির আশা করে। কখনো কখনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে ভারী অঙ্কের অনুদান দেয়, বাহ্যত সে কোনো প্রতিদান চায় না। কিন্তু তার অঘোষিত প্রবল ইচ্ছা থাকে জনগণের সামনে তার এই অনুদানের কথা ঘোষণা করা হোক। এই অনুদান বাহ্যত অনুদান মনে হলেও তা মূলত বিনিময় চুক্তিরই অতি সূক্ষ্মরূপ। একমাত্র আল্লাহই দান করেন কোনো প্রতিদান চাওয়া ছাড়া। দুনিয়াতে কেউ আপনাকে বিনিময় ছাড়া কিছুই দেবে না। কেবল আল্লাহর মুমিন বান্দাগণ যা করেন, বিনিময় ছাড়া করেন। তবে তারা তাদের কল্যাণমূলক কাজের প্রতিদান প্রত্যাশা করেন তাদের রবের নিকটে। আর যে রবের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, সে কখনো কোনো মানুষকে একটু উপকার করে প্রতিদান চেয়ে বসে না।

যারা বিচক্ষণ তারা অনুগ্রহ করে, মানুষের কাছ থেকে এর প্রতিদানের আশা করে না। তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। জান্নাতের প্রত্যাশা করে। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য যে প্রতিদান গচ্ছিত রয়েছে তার জন্যই শুধু ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মানুষকে নিঃস্বার্থ দানকারী বলা যায় না।

আপনাকে কেউ কিছু দান করলে আপনি হয়তো তাকেই মূল দাতা ভেবে বসে থাকবেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, আপনাকে দান করার অনুপ্রেরণা তার মনে কোথা থেকে এলো?

একজন আল্লাহভীরু আলিমের ঘটনা

সিরিয়ার 'তারাবুলুস'-এ একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন। কোনো কারণে বাড়ির মালিক তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইলেন। আইনও তার পক্ষে ছিল, সে আলিমের নামে মামলা করে তার দাবি প্রমাণও করে ফেলেছিল। অতএব, আলিমের জন্য সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আবার এই বাসা ছাড়া তার অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গাও ছিল না। এরপর যা ঘটল তা সত্যিই অবাক করা একটি ঘটনা!

তারাবুলুসেরই একজন ধনী ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, অমুক লোকটির জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করে দাও।

ঘুম থেকে পড়িমরি করে জেগে উঠল সে। তার কাছে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তবু আলিমকে খুঁজতে শুরু করল এবং পেয়েও গেল। আলিমের কাছে এসে আবদার জানাল, 'আপনি আপনার মনমতো যেকোনো একটি বাড়ি পছন্দ করুন। ইনশাআল্লাহ আমি অর্থের ব্যবস্থা করব।'

মাঝে মাঝে এমন হয় যে, আপনি সরকারি, বেসরকারি কোনো অফিসে গেছেন, সেখানকার দায়িত্বরত কর্মকর্তার সামনে দাঁড়াতেই বলে দেয়, 'ঠিক আছে, হয়ে যাবে।' কোনো ঝামেলা ছাড়াই আপনার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ায় আপনি আপ্লুত হন। কিন্তু ভেতর থেকে মূলত আল্লাহই এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ যখন আপনাকে পরীক্ষায় ফেলতে চান, আপনার কোনো অসংগতি সংশোধন করতে চান, তখন আপনার সামনে হাজার বাধা উপস্থিত করে দেন। তখন অফিসিয়াল একটু প্রয়োজন সারতেই কারো স্বাক্ষরের জন্য দিনের পর দিন ঘুরতে হয়।

অতএব, আপনাকে কেউ কিছু দিলে মনে মনে নিশ্চিত বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ তাআলাই তার অন্তরে আপনাকে দেওয়ার প্রেরণা তৈরি করেছেন। অফিস কর্মকর্তার মনে আপনার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছেন। তিনিই তার মনে আপনার প্রতি শিথিলতা প্রদর্শনের কারণ সৃষ্টি করেছেন।

কৃতজ্ঞ থাকুন মানুষের প্রতি

আপনার প্রতি কেউ অনুগ্রহ করলে, কেউ আপনাকে উপকার করলে কিংবা কেউ আপনাকে কিছু উপহার দিলে আপনি অবশ্যই তার শুকরিয়া জানাবেন। তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।'[১]

কারণ যে মানুষটি আপনার একটু উপকার করল, আপনার প্রতি অনুগ্রহ করল, সে কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ। আপনার যেমন কোনো কাজ করা না-করার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, তেমনি তারও রয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, আপনাকে সেবা দেওয়া বা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করার মানসিকতা তাকে আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। কিন্তু তারপর কাজ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। সে চাইলে কাজটি না-ও করতে পারত। সে যেহেতু কাজটি করা না করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিল, তাই যখন সে আপনার কাজ করে দিলো, তখন সেও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। কেউ আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে কিছু চাইলে তোমরা তা দিয়ে দাও। কেউ তোমাদের প্রতি উত্তম আচরণ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো কোনো কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য এত বেশি দুআ করতে থাকো, যাতে তোমাদের অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।'[২]

ওপরের হাদিসে কী উত্তম শিষ্টাচারই না শিক্ষা দেওয়া হয়েছে! কিন্তু আমরা কতজন এর প্রতি লক্ষ রাখি? অনেকেই মনে করে, কেউ কোনো উপকার করলে তাকে শুধু জাযাকাল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন ইত্যাদি কিছু দুআ শুনিয়ে দিলেই সে তার প্রতিদান আদায় করে ফেলল। কিন্তু হাদিসের মূল শিক্ষা হলো, কেউ আপনাকে কোনো সেবা দিলে, অনুগ্রহ করলে আপনার দায়িত্ব তাকে এর বিনিময় দেওয়া। তবে একান্ত অপারগতার কারণে প্রতিদান দিতে অক্ষম হলে তার জন্য দুআ করুন। এখন দুআ করে দিলেও তা

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১১৩০০

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬৭৪

আল্লাহর নিকট বিনিময় বলেই গণ্য হবে।

আবু ফিরাস রাবিআ ইবনু কাব আসলামি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মাঝে মাঝে রাতের বেলায় অবস্থান করতাম। আমি তার কাছে ওজুর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশি হয়ে) বললেন, 'তুমি কী পেতে চাও বলো।' আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।' তিনি বললেন, 'এ ছাড়া আর কিছু?' আমি বললাম, 'এটাই আমার নিবেদন।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদার মাধ্যমে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য করো।'[১]

জীবনে আপনি যে সকল ভালো কাজ করেছেন সেগুলো স্মরণ করবেন না। আবার আপনার প্রতি মানুষ যে ভালো আচরণ করেছে তা কখনো ভুলে যাবেন না। আপনি কাউকে সেবা করলেন, তখন আপনার মানবিক মহত্ত্বের দাবি আপনি তা ভুলে যাবেন। এমনভাবে ভুলে যাবেন, যেন আপনি কিছুই করেননি। কারণ, আপনি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার জন্যই করেছেন। তাহলে সেটা মনে রেখে লাভ কী? মনে রাখলে হয়তো কেউ আপনার অনুগ্রহ স্বীকার করবে, আপনি আপ্লুত হবেন। অথবা অস্বীকার করলে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন। কিন্তু যে কাজ আপনি আল্লাহর জন্য করেছেন তাতে কষ্ট পাওয়ার কী আছে? আপনি কী মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য করেছেন? তাই নিজের অনুগ্রহকে ভুলে যান। সুমহান আল্লাহ বলেন—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝

পুণ্যবান বান্দাগণ খাবারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও ইয়াতিম, মিসকিন ও বন্দিদের খাবার দান করে এবং বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান আশা করি না; কোনো কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না।'[২]

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪৮৯; *জামি তিরমিজি* : ৩৪১৬, *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৩৮, ১৬১৮, *সুনানু আবি দাউদ* : ১৩২০; *সুনানু ইবনু মাজাহ* : ৩৮৭৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬১৩৮; *রিয়াযুস সালেহিন* : ১০৮

[২] সুরা দাহর, আয়াত : ৮-৯

তাই আপনার অনুগ্রহকে আপনি মনে রাখার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু আপনার প্রতি কেউ অনুগ্রহ করল আর আপনি তা ভুলে গেলেন, এটা অনেক বড় অপরাধ। আল্লাহ তাআলাই তার অন্তরে আপনার প্রতি অনুগ্রহের বোধ জাগ্রত করেছেন। কিন্তু সে কাজটি করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ব্যয় করে। সে বলতে পারত, 'আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি কাজটি করতে পারব না।'

ইচ্ছাধিকার থাকা সত্ত্বেও সে আপনার কাজটি করে দিয়েছে। অতএব, সেও শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও নবিজির নির্দেশ।

আপনি জীবনে এমন অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন যে, হঠাৎ কেউ একজন এসে আপনার কোনো কাজ করে দিয়েছে অথচ আপনি তাকে চেনেনও না। সে আপনার সামনে এসে ভালোবাসায় বিগলিত হয়ে আপনার প্রয়োজন পূরণ করে দিলো। তখন নিশ্চয় একজন ভদ্র মানুষ তাকে ধন্যবাদ জানাবে। এবং বিস্মিত হয়ে বলে উঠবে, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ।

আয়িশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে যখন মুনাফিকরা অপবাদ ছড়িয়ে দিলো, আল্লাহর নবিও কিছুটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেলেন। কিন্তু পরবর্তীতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। আয়াত নাযিল হওয়ার পর, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়িশাকে লক্ষ করে বললেন, নবিজির কাছে যাও। তিনি সোজা জানিয়ে দিলেন, 'আমি কারো কাছে যাব না। আমি শুধু আল্লাহকেই শুকরিয়া জানাব, যিনি আমার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন।'[১]

চাপা ক্ষোভ আর অভিমানে এতদিন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছেন। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায় নীরব ভূমিকা তিনি মেনে নিতে পারেননি। পরে অভিমান ভেঙে গেলে তিনি রাসুলুল্লাহর সাথেই গিয়েছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তার ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল করা হবে, মসজিদে মসজিদে সালাতের কিরাআতে তা তিলাওয়াত করা হবে। কিন্তু তার জন্য যা ছিল কল্পনাতীত, সেটাই আল্লাহ তাআলা বাস্তব করে দেখিয়েছেন। তাই তার মনের গভীর থেকে তখন শুধু আল্লাহর জন্যই শুকরিয়া বেরিয়ে এসেছে।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৬৬১

কোনো একটা ব্যাপারে একবার একজন লোক রাসুলুল্লাহকে বলল, 'আল্লাহ এবং আপনি যা চাইবেন তা-ই হবে।' নবিজি সাথে সাথে লোকটিকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরিক করলে? বলো, আল্লাহ যা চান তা-ই হবে।'[১]

অতএব, সবকিছুর দাতা একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা দান করেন বিনিময় ছাড়াই দান করেন। কোনো মধ্যস্থতা, কৌশল অবলম্বন করা ছাড়াই দান করেন। চাওয়া ছাড়াই দান করেন। বান্দার অবাধ্যতার কারণে নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেন না।

তাই সব কাজের প্রকৃত প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ। তিনিই উদার দানশীল, আল-ওয়াহহাব।

একজন মুমিন হিসেবে যখন আপনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে, সকল নিয়ামত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই, তখন আল্লাহর সামনে লুটিয়ে পড়ুন। তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা আদায় করুন। হৃদয়ের গভীর থেকে শুকরিয়া জানান। আল্লাহর শোকরের তিনটি ধাপ রয়েছে। এই তিন ধাপে উত্তীর্ণ হোন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চেতনায়।

এক. অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করুন, আমরা যে নিয়ামত ভোগ করি, সুখময় জীবন উপভোগ করি এর সবকিছুই আল্লাহর দান।

দুই. আল্লাহর প্রশংসায় নত হয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে ফেলুন আপনার হৃদয়।

তিন. আল্লাহর বান্দাদের সেবায় অংশ নিন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিন। দুঃখ-দুর্দশা ঘুচিয়ে চেষ্টা করুন তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে।

আপনি নিশ্চিত থাকুন যিনি দুনিয়াকে অসংখ্য অনুগ্রহের ফুল-ফসলে সবুজ শ্যামল বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আখিরাতেও আপনাকে বঞ্চিত করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৮০

অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ ছাড়া আর কী হতে পারে?[১]

বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় রয়েছে, ততক্ষণ আল্লাহ তার সহযোগিতায় রয়েছেন।

আমার পরিচিত এক ভাই ছিল। সে নিজের কর্মস্থলেই একটি কারিগরি কাজ করত। তার মাসিক আয় ছিল মাত্র দু-হাজার পাউন্ড। তার এক দ্বীনি ভাই হঠাৎ চাকরি হারিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে। এরপর সে প্রথম ভাইটির কাছে এসে তার অসহায়ত্বের কথা জানায়। সে তাকে ফিফটি পার্সেন্ট লাভে তার সাথেই কাজ করার সুযোগ দেয়। আল্লাহর কী অপার মহিমা! প্রথম মাস থেকেই লোকটি তার গড়পড়তা আয়ের দশগুণ বেশি আয় করতে শুরু করে।

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দরিদ্র একজন সাহাবি। তারপরও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, 'বিলাল! খরচ করো, কখনো মহান আরশের অধিপতির সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কোরো না।'[২]

[১] সুরা রাহমান, আয়াত : ৬০

[২] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহাহ* : ২৬৬১

আল-আজিজ : اَلْعَزِيزُ

মহাপরাক্রমশালী, অপরাজেয়, দুর্লভ

পৃথিবীতে কোনো মানুষ যত বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোক না কেন, কাউকে ক্ষমা করতে গিয়ে স্বজনপ্রীতি, অদূরদর্শিতা বা অন্য কোনো কারণে সে ভুল করতে পারে। এজন্য কখনো তাকে দাঁড়াতে হতে পারে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায়। তুমি তাকে কেন ক্ষমা করেছ? কেন তাকে শাস্তি দিলে না? কেন তার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করলে? নানা প্রশ্নে জর্জরিত করা হতে পারে তাকে। কিন্তু মহান আল্লাহ এমন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় যে, বান্দাকে ক্ষমার ক্ষেত্রে তিনি কখনো ভুল করেন না। আবার তিনি কাউকে ক্ষমা করে দিলে তাতে প্রশ্ন তোলার অধিকার কারো নেই। কারণ তিনি আল-আজিজ, মহাপরাক্রমশালী।

☆☆☆

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামের একটি দুআ উল্লেখ করেছেন, যেখানে আল-আজিজ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে মহাপরাক্রমশালী অর্থে—

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

(হে আমার রব!) যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৮

আয়াতের প্রকাশভঙ্গি কারো কাছে অসংলগ্ন মনে হতে পারে। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষমার সাথে পরাক্রমের সম্পর্ক নেই। বরং ক্ষমার সাথে আয়াতের প্রকাশভঙ্গি এমন হওয়াই অধিক সংগত ছিল যে—‘যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তো আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।’

কিন্তু কুরআনুল কারিমে বর্ণিত ঈসা আলাইহিস সালামের এই দুআর ভাষাশৈলী, অনন্যতা ও প্রকাশভঙ্গির অলংকার লক্ষ করুন। এখানে ক্ষমার সাথে ক্ষমাশীল এবং করুণাময় সংযুক্ত না করে বরং পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ, আল্লাহ যদি চরম অপরাধীকেও বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেন, তবে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে বাধা দিতে পারবে কিংবা তাঁর ক্ষমা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারবে—

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তারাই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।[১]

এভাবে কুরআনের বহু জায়গায় আমরা পরাক্রমশালী অর্থে আল-আজিজ নামটির ব্যবহার দেখতে পাই—

...إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

যারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা (প্রতিশোধগ্রহণকারী)।[২]

অর্থাৎ যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে, আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই ঔদ্ধত্যের কারণে কঠিন শাস্তি দেবেন। দুনিয়াতে তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, সকল

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

[২] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৪

শক্তিধরের চেয়ে শক্তিশালী, অসীম ক্ষমতাধর। তিনি প্রতিশোধগ্রহণকারী। অতএব, যারাই অবাধ্য হবে, সেই অবাধ্যতার শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

নিচের আয়াতগুলোতে আল্লাহর মহাপরাক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পূর্ণ মাত্রায়—

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

তারা বলে, 'আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে সবল ব্যক্তি অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কার করবে।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসুল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকরা এটা জানে না।[২]

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

তারা যা আরোপ করে তা থেকে আপনার রব পবিত্র ও মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।[৩]

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

সে (ইবলিস) বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকেই পথভ্রষ্ট করব।[৪]

[১] সুরা জাসিয়া, আয়াত : ৩৭

[২] সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮

[৩] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৮০

[৪] সুরা সাদ, আয়াত : ৮২

তিনি অপরাজেয় এবং অপ্রতিহত

মানুষ কখনো বিজয়ী হয়, কখনো তাকে পরাজয় বরণ করে নিতে হয়। কিন্তু এমন এক সত্তা আছেন, যিনি কখনো পরাজিত হন না, যাকে কেউ ঘায়েল করতে পারে না, যার ওপর অন্য কারো বিজয়ী হওয়া অসম্ভব। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত আল-আজিজ; অপরাজেয় এক প্রভু। মহান আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন—

...وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

আল্লাহ তাঁর কার্যসম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[১]

আল্লাহ নিজে ঘোষণা করেছেন, তিনি স্বীয় কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

মানুষ যদি জানত এবং নিশ্চিত বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ নিজ কার্যসম্পাদনে অপ্রতিহত, তাহলে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করত। ভরসা করত একমাত্র তাঁর ওপর। নিবিষ্ট হতো একমাত্র তাঁরই অভিমুখে। আর বর্জন করত আল্লাহ ছাড়া সমস্ত উপাস্য।

দুর্লভ ও অনন্য সেই সত্তা

কোনো সত্তা বা বস্তু দুর্লভ হিসেবে বিবেচিত হয় মানুষের প্রয়োজন অনুসারে। যেমন : কোনো দেশে একটি বিরাট খনি আবিষ্কৃত হলো। এমন খনি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কিন্তু সেখানকার খনিজ পদার্থ মানুষের খুব একটা কাজে আসে না। তার মানে খনি বিরল হলেও তা দুর্লভ হিসেবে বিবেচিত নয়।

আবার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একজনই হয়। তাই অন্যদের তুলনায় সে অনন্য। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, তার কাছে সকল জনগণের প্রয়োজন নেই। তার দেশের প্রতিটি প্রান্তে, সীমান্ত অঞ্চলে এমন অনেক রাখাল আর যাযাবর লোক পাওয়া

---

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ২১

যাবে যারা ছোট্ট একটি তাঁবু বা কুঁড়েঘরে বাস করে। পশুপাল, প্রাকৃতিক খাবার, নদী-ঝরনার পানি—এসব নিয়েই তাদের পৃথিবী। একদিনের জন্যও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই রাষ্ট্রপ্রধানকে ঠিক দুর্লভ বা অনন্য বলা চলে না।

অপরদিকে মহান আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন। বিশ্বজগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। প্রতিটি জিন-ইনসান, উদ্ভিদ-প্রাণী, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ, গ্যালাক্সি—সবই আল্লাহর অনুগ্রহের কাঙাল। তাঁর প্রতি সবকিছুর প্রয়োজন এতটাই তীব্র আর অধিক যে, কোনো কিছুই তাঁর নির্দেশ ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না।

আমাদের দু-চোখের মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিখুঁত ব্যবস্থাপনার কথাই ধরা যাক। আমরা কোনো বস্তু তখনই দেখতে পাব, যখন বস্তুটি থেকে আলোকরশ্মি আমাদের চোখে এসে পড়ে। কিন্তু কীভাবে আমরা দেখতে পাই তা কি কখনো ভেবেছেন আপনি? আলোকরশ্মি প্রথমে আমাদের চোখের কর্নিয়া ভেদ করে পিউপিলের মধ্য দিয়ে লেন্সে গিয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কর্নিয়া হচ্ছে খুবই স্বচ্ছ আর পাতলা একটি পর্দা, যা চোখের আবরণ হিসেবে কাজ করে। পিউপিলের আরেক নাম চোখের মণি; চোখের ঠিক মাঝখানে কালো রংয়ের ছোট্ট একটি বিন্দু। পিউপিল মূলত একটা ছিদ্র। এই ছিদ্রের পেছনেই থাকে একটি দ্বি-উত্তল লেন্স।

লেন্সের কারণে আগত আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়ে রেটিনায় আছড়ে পড়ে। ফলে রেটিনার ওপর বস্তুর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। উল্লেখ্য, চোখের পেছন দিকের একটি পাতলা স্তরের নাম রেটিনা। এখানে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নিউরন আর অগণিত আলোক সংবেদী কোষ। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বটি আলোক সংবেদী কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এ উদ্দীপনা বাইপোলার কোষ, গ্যাংলিয়ন কোষ ও অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কের ভিজুয়াল কর্টেক্সে গিয়ে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক তখন উল্টো প্রতিবিম্বটি পুনরায় উল্টে দেয়। এতে করে আমরা বস্তুটিকে সোজা দেখতে পাই।

এভাবে শুধু চোখ নয়; আপনার নাক, কান, জিহ্বা, মস্তিষ্ক, ধমনি, হাড়, মাংস ও মাংসপেশী সবক্ষেত্রেই আপনি আল্লাহর করুণার মুখাপেক্ষী। আল্লাহর কুদরত ব্যতীত সবকিছুই স্থবির, নিশ্চল।

তাই তো আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন আল-আজিজ, যার একটি অর্থ—অনন্য, দুর্লভ। যার সাদৃশ্য নেই, যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কিছু নেই। তিনি এমন 'দুর্লভ' এক সত্তা, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, কোনো সমকক্ষ নেই। বরং সুস্থ বিবেক-বিবেচনার দর্পণে তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা তাঁর কোনো সমকক্ষ থাকাই কল্পনাতীত।

প্রকৃত সম্মানদাতা কেবলই তিনি

আল-আজিজ নামের আরেকটি অর্থ রয়েছে, যা অতিসূক্ষ্ম ও তাৎপর্যময়। আল-আজিজ মানে সম্মানদাতা। এ অর্থের বিবেচনায় এটা আল্লাহর কর্মবাচক নাম। অর্থাৎ যিনি সম্মান দান করেন। সম্মান, অপমান সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সুমহান আল্লাহ বলেন—

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে আপনি লাঞ্ছিত করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[১]

আন্দালুসের শেষ সম্রাট আন্দালুস ছেড়ে যাওয়ার সময় কাঁদতে শুরু করল। তখন তার মা আয়িশা বলল, 'কাঁদো! নারীদের মতো কাঁদতে থাকো। ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রটিকে তুমি পুরুষদের মতো রক্ষা করতে পারোনি।'

সত্যিই তো! সেই মানুষের মূল্য কোথায়, আল্লাহ যাকে বর্জন করেছেন! আল্লাহই যার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন!

আপনার জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ আপনার ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও সম্মান। জীবনে মর্যাদা ও মূল্যবোধ ছাড়া বেঁচে থাকাটা খুবই কষ্টকর। যদি আপনি আল্লাহর সাথে থাকেন, আল-আজিজের সঙ্গী হোন, তবে তিনিই আপনাকে সম্মানিত করবেন। তিনিই আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

---

[১] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ২৬

মহান আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩

আপনি কি দেখেন না, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহকে সিজদা করে? এবং চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে আরও অনেকেই সিজদা করে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।[১]

আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে কেউই জানতে পারে না। একমাত্র আল্লাহই নিজ সত্তাকে পূর্ণ ও সঠিকভাবে জানেন। আপনার দায়িত্ব হলো আল্লাহর পরিচয় জানার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা; মনিব-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। আল্লাহর আদেশ ও বিধি-বিধানের ওপর অটল, অবিচল থাকুন; সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান—অবশ্যই আপনি পৌঁছে যাবেন আল্লাহর অতি নিকটে।

এক যুবকের বিচিত্র প্রেম

একবার এক যুবক একটি মেয়ের প্রেমে পাগল হয়েছিল। মেয়েটির বাবা ছিলেন আলিম। তিনি ছেলেটিকে বললেন, 'এক শর্তে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। মসজিদে কুরআনের তাফসির-বিষয়ক যে দারসগুলো অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তোমাকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হবে।' মেয়ের বাবার কথামতো যুবকটি দারসে উপস্থিত হতে লাগল। একপর্যায়ে সে তাফসিরের দারসে এত বেশি মগ্ন হয়ে গেল যে, মেয়েটির কথা ভুলেই গেল।

মেয়েটি একদিন এই মর্মে চিঠি পাঠাল, 'প্রিয়, তুমি তো আমাদের ভুলেই গেলে!'

উত্তরে ছেলেটি বলল, 'তুমি আমার মিলনের কারণ! তোমার মাধ্যমেই আমি এই মোবারক দারসের সাথে মিলিত হয়েছি। আমি চাই না, তুমি আবার বিচ্ছেদের কারণ হও!'

---

[১] সূরা হজ, আয়াত : ১৮; এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলে সিজদা দিতে হয়।

আপনি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারেন তাঁর আনুগত্যের দ্বারা। যেভাবে গোলাম তার মনিবের সাথে মিলিত হয়। আপনি তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন বেশি বেশি নেক আমল করার দ্বারা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সেবার মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর জাত ও সিফাত—সত্তা ও গুণাবলির পূর্ণ অনুধাবন এবং সামগ্রিক ও পরিপূর্ণভাবে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি কারো নেই। নবি-রাসুলকেও তিনি সেই শক্তি দান করেননি।

কারণ, আল-আজিজ ঐ মহান সত্তার গুণবাচক নাম; যার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে মানব-মস্তিষ্ক অচল; যার নিয়ামতরাজি উপলব্ধিতে বিবেক-বুদ্ধি হতচকিত; যার গুণকীর্তনে জিহ্বা ক্লান্ত; যার সৌন্দর্য বর্ণনায় মানব-প্রতিভা, ভাষা-সাহিত্য সবকিছুই অকার্যকর।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি সংক্ষিপ্ত শব্দে আল্লাহর শাশ্বত গুণ উল্লেখ করেছেন।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

এক রাতে নবিজিকে বিছানায় না পেয়ে আমি তাকে খুঁজতে থাকি। (অবশেষে আমি তাকে মসজিদে নববিতে খুঁজে পাই।) আমার হাতের স্পর্শ লাগে নবিজির পায়ে।[১] তখন তিনি মসজিদে নববিতে সিজদারত ছিলেন। তার দু-পা ছিল সোজা। সিজদায় তিনি এই দুআ করছিলেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُبْلِغُ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টির দ্বারা আপনার ক্রোধ থেকে পানাহ চাই। আপনার ক্ষমার দোহাই দিয়ে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ চাই। এবং আমি পানাহ চাই আপনার থেকে (আপনার ক্রোধ ও শাস্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে)। আমি আপনার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে শেষ করতে পারব না। আপনি তো তেমনই, যেমনিভাবে আপনি নিজের প্রশংসা করেছেন।'[২]

---

[১] সে সময়ে মসজিদে নববি ছিল মা আয়িশার ঘরের সাথে লাগোয়া এবং খেজুর গাছের পাতা ও ডালপালা দিয়ে নির্মিত ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। রাতের নিকষকালো আঁধারে সেদিন মা আয়িশা কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই অন্ধকারে হাতড়ে নবিজিকে খুঁজতে শুরু করেন।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৪৮৬

আপনি যখন আল-আজিজের অর্থ হৃদয়ঙ্গাম করবেন এবং আপনার মন-আত্মায় তার মর্ম ধারণ করবেন, তখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুই আপনার অন্তর থেকে বিদায় নেবে। আপনি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সামনে নত হতে পারবেন না। আল্লাহর পরাক্রমের সামনে কোনো ক্ষমতাধর খুঁজে পাবেন না। আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের সামনে অন্য কোনো শক্তি আপনাকে পরাভূত করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহর প্রজ্ঞা ও সুব্যবস্থাপনার সামনে অন্য কোনো প্রজ্ঞাবানও খুঁজে পাবেন না।

কেউ কেউ মনে করে সামান্য চেষ্টায় জান্নাতে চলে যাবে। তাদের দাবি নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত। দুনিয়ার সাধারণ একজন নারীকে বিয়ে করতে গেলেও উপযুক্ত ও সম্মানজনক মোহরানা পরিশোধ করতে হয়। তাহলে আল্লাহর জান্নাত এবং সেই জান্নাতি রমণীদের মূল্য কি সামান্য হতে পারে?

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যারা কোনো স্থানে রাত্রিযাপন করতে ভয় পায় তারা সন্ধ্যায়ই যাত্রা করে। আর যারা সন্ধ্যায়ই যাত্রা করে তারা (গভীর রাতের আগেই) নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। জেনে রেখো, আল্লাহর পণ্যগুলো খুবই মূল্যবান; আর আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত।'[১][২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় করো আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[৩]

[১] *জামি তিরমিজি* : ২৪৫০

[২] অর্থাৎ, বিপদের আশঙ্কা এড়াতে আমরা যেমন নিরাপদ সময়ে সফর করি, ঠিক তেমনি শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে হলে আমাদের অবশ্যই উদ্যমের সাথে ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য করে যেতে হবে।

[৩] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৯২

আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সময়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত আপনার প্রিয় সম্পদ এবং যৌবনোদ্দীপ্ত শক্তি—এগুলো আল্লাহর পথেই ব্যয় করুন। কারণ, আল্লাহর পণ্য খুবই দামি।

মানুষ যেভাবে সম্মানিত হয়

প্রকৃত সম্মানিত কে? নবি-রাসুলগণ সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, কিন্তু কেন? কারণ তাদের জন্যে আল্লাহ বরাদ্দ রেখেছেন নবুওয়াত, তাদের মধ্যে দান করেছেন আপন ইলম। আর পৃথিবীর সকল মানুষ দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ে তাদের অনুসারী। দুনিয়াবাসীর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া, নিয়ামত ও হিদায়াতের নুর অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাদের বানিয়েছেন প্রধান ফটক। তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হন; তাদেরকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার নামান্তর। তাদের অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু জুড়েই রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রিসালাতের প্রচার এবং আল্লাহর প্রতি অগাধ প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ; তাই আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

দুনিয়ার একজন বাদশা। যদি তার প্রজাদের ওপর শাসনক্ষমতা এবং রাজ্যের সবকিছু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে, তাহলে সে নিজেকে ভাবতে থাকে শক্তিধর, পরাক্রমশালী। প্রজাদের প্রয়োজন তার কাছে যত বেশি তীব্র ও অধিক হয়, তত বেশি সে অহংকারী হয়ে ওঠে।

অথচ মুমিন বান্দা! সেও ক্ষমতাবান হয়, তার কাছেও জনগণের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু তার মাঝে আর দ্বীনবিমুখ শাসকের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। দ্বীনবিমুখ শাসক ক্ষমতা পেয়ে হয়ে ওঠে উদ্ধত, অহংকারী, ইতর। আর মুমিন ক্ষমতাধর হলেও সে হয় বিনয়ী; আল্লাহর সমুখে মস্তকাবনত।

আমি হৃদয়ের গভীর থেকেই আপনাকে একটি কথা বলছি, 'আপনি আল্লাহকে চিনবেন, তাঁর আনুগত্য করবেন, এরপর আবার অন্য কারো সামনে মাথা নত করবেন—এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। যদি আপনি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে চিনে থাকেন তাহলে আপনি মান-সম্মান, ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা সবকিছুই খুঁজবেন কেবল আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

নিশ্চয় শক্তি তো কেবল আল্লাহরই এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনদের; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।[১]

আপনি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দুআ করছেন—

إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

নিশ্চয় আপনি যার বন্ধু হয়ে যান, কেউ তাকে অপদস্থ করতে পারে না। আর আপনি যার সাথে শত্রুতাপোষণ করেন, তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। হে আমাদের রব, আপনি কল্যাণের অধিকারী, সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন[২]

প্রতিদিনের দুআয়, প্রতি মুহূর্তের প্রার্থনায় আপনি রয়েছেন শক্তিধর মহান মালিক আল-আজিজের সাথে। এরপর কি আপনি কখনো লাঞ্ছিত হতে পারেন? এটা কখনো সম্ভব নয়।

আল্লাহর সঠিক পরিচিতি লাভ করুন, তাকে ভালোবাসুন। অটল অবিচল থাকুন তাঁরই পথে। দেখবেন, এই দুনিয়াতেই আল্লাহ আপনাকে তাঁর উত্তম প্রতিফলন দেখিয়ে দেবেন। হৃদয়ের গভীর থেকে আপনি অনুভব করবেন, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন, আপনাকে গুরুত্ব দেন।

আপনি তাকে ডাকবেন, তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেবেন। তাঁর কাছে দুআ করবেন, তিনি আপনার বিপদ-আপদ দূর করে দেবেন। আপনি তাঁর শরণাপন্ন হবেন, তিনি মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির হৃদয়ে আপনার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেবেন। আপনি তাঁর কাছে সাহায্য চাইবেন, তিনি আপনার শত্রুদের অন্তর নরম করে দেবেন। মনের কামনা-বাসনা তাঁর সামনে তুলে ধরবেন, তিনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করে দেবেন। আপনি তাঁর নামে কসম করবেন, তিনি আপনার কাজে বারাকাহ দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন—

...فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

---

[১] সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৪২৭

আপনি তো রয়েছেন আমার চোখের সামনে। আপনি আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করেন।[১]

হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি মানুষের কাছ থেকে এত সম্মান ও ভালোবাসা কীভাবে অর্জন করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, দুটি জিনিস দ্বারা—এক. তাদের দুনিয়ার প্রতি আমার অনাগ্রহ। দুই. আমার ইলমের প্রতি তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।[২]

অর্থাৎ মানুষের কাছে যে দুনিয়া রয়েছে, তা থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে রেখেছি। তাই দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে আমি তাদের চোখে হেয় হইনি কখনো। পক্ষান্তরে আমার কাছে যে ইলম রয়েছে তা থেকে তারা প্রয়োজনমুক্ত নয়। তাই ইলমের প্রয়োজনে তারা আমার কাছে আসে আমার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে।

লোভী ব্যক্তি কখনো সম্মানিত হতে পারে না। মানুষের কাছে যে দুনিয়া রয়েছে তার প্রতি সামান্য লোভও আপনাকে অপদস্থ ও হেয় করে ছাড়বে। তাদের সম্পদে যদি আপনি লোভ করেন, তাহলে তারা আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। কিন্তু আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি বান্দার চাওয়ার কারণে কখনো বিরক্ত হন না। মানুষের সম্পদ সীমিত, তাই সে সম্পদে কার্পণ্য করে। কিন্তু আল্লাহর সম্পদ অসীম, তাই তিনি দান করতে ভালোবাসেন। তিনি শক্তি ও সম্মানের রব। তাঁর কাছেই সম্পদ প্রার্থনা করুন। আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাতে যদি আপনি লোভ করতে পারেন, তবে আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন।

মানুষের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে, কোনো প্রয়োজন ব্যক্ত করলে সে রেগে যায়। কিন্তু আল্লাহ এমন মহান মালিক, যিনি না চাইলে ক্রোধান্বিত হন। মানুষের সামনে নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোনো মুমিনের জন্য একদমই বেমানান।

জুনদুব ইবনু হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

---

[১] সুরা তুর, আয়াত : ৪৮

[২] *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৫

নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, মুমিন কীভাবে নিজেকে লাঞ্ছিত করে, ইয়া রাসুলাল্লাহ? নবিজি উত্তর দিলেন, নিজেকে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন করা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাধ্য তার নেই।[১]

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রয়োজন তালাশ করো আত্মমর্যাদার সাথে। কারণ সবকিছুই তার নির্ধারিত পরিমাণেই চলতে থাকবে।'[২]

খলিফার দরবারে ইমাম আবু হানিফা

একবার ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ একটি সমস্যা সমাধানে খলিফা আবু জাফর আল মানসুরের দরবারে গমন করেন। এই মহান ফকিহর আগমনে খলিফা খুবই গর্বিত হন। ইমামের কথা-বার্তা, ইলম, বিচক্ষণতা এবং ভাবগাম্ভীর্যে খলিফা মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি মনে মনে চাইতে থাকেন, প্রতিদিনই যেন এই মহান ইমাম তার দরবার অলংকৃত করেন। খলিফা খুব বিনীতভাবে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে আবেদন করেন—আবু হানিফা! আমাদের দরবারে আপনাকে স্বাগত। আমরা কামনা করি, আপনি প্রতিদিনই আমাদের দরবার অলংকৃত করুন। আপনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে সদা-সর্বদা সাদর অভ্যর্থনা জারি থাকবে। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে বললেন, 'আপনাদের কাছে আমার আসার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আপনাদের কাছে এসে তারাই তোষামোদে লিপ্ত হয়, যারা কোনো ব্যাপারে আপনাদের ভয় পায়। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে এমন কিছু দেখি না যাতে আমার ভয় পাবার কোনো যৌক্তিকতা রয়েছে।'

যখনই আপনি মানুষের কাছে থাকা জিনিস থেকে লোভ সংবরণ করবেন, তখনই আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করে দেবেন। যত বেশি আল্লাহর সামনে নত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে সিজদা করবেন, তত বেশি আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাবান করে তুলবেন।

ইমাম মালিকের আত্মমর্যাদাবোধ

খলিফা হারুনুর রশিদ রাজ-দরবারে 'নাসিহাহ' করার জন্য একজন বড় আলিম তলব করলেন। লোকেরা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর কাছে ছুটে গেল। তারা তাকে

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ২২৫৪

[২] *তারিখু দিমাশক*, খণ্ড : ১৫; পৃষ্ঠা : ৫

জানাল, খলিফা আপনাকে তলব করছেন। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, তার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আমার কাছে তার কোনো প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে তিনি নিজেই আমার কাছে আসতে পারেন। তিনি আরো বললেন, 'ইলম অন্বেষণ করতে হয়; ইলম কাউকে অন্বেষণ করে না'।

সভাসদ ও মন্ত্রীবর্গ খলিফাকে ইমাম মালিকের উত্তর সম্পর্কে জানাল। খলিফা বললেন, 'তিনি সত্য বলেছেন, আমিই তার কাছে যাব।'

বিশাল জনতার মজলিস, ইমাম মালিকের হাদিসের দারস। খলিফা আগমন করলেন মজলিসে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ সাথিদের বললেন, 'খলিফাকে জানিয়ে দাও, মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে আসার অনুমতি নেই। তিনি যেন মজলিসের শেষ প্রান্তে যেখানে জায়গা পান সেখানেই বসে পড়েন।' খলিফা মজলিসে পৌঁছার পর লোকেরা তাকে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিলো। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করেন। আর যে অহংকার প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে নিচু করে দেন।'

এ কথা শুনে খলিফা বললেন, 'চেয়ার সরিয়ে নাও, আমি নিচেই বসব।'[১]

নবিজির বিনয় ও সরলতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের গর্দান ডিঙিয়ে সামনে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজেও মজলিসের যেখানে জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে পড়তেন। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, তিনি এতটাই সাধারণভাবে বসতেন যে, কোনো বেদুইন বা অপরিচিত লোক এসে তাকে চিনতে পারত না। জিজ্ঞেস করত, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? অথচ এই পৃথিবীর বুকে নবিজির চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান মানুষ আর কেউ কি আছে?

প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুয়ে আছেন মদিনায়। সেখানে অসংখ্য মানুষের ভিড় লেগে থাকে। কত রাজা-বাদশা, আমির-উমারা, শাসক-নেতা আসে। সেখানে কি কেউ রাজা-বাদশা পরিচয়ে সালাম করে? নবিজির কাছে কেউ রাজা নয়। তার কাছে সবাই সমান। নবিজির মৃত্যুর আজ প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পার

---

[১] *তারতিবুল মাদারিক*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৮০

হয়েছে। তবু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজা-বাদশাদের সেখানে ছুটে আসার হেতু কী? কারণ নবিজিকে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন। অথচ জীবদ্দশায় একজন সাধারণ মানুষ ও গোলামের সাথেও তিনি দেখিয়েছেন সর্বোচ্চ বিনয় ও কোমল আচরণ।

কোনো সাধারণ মানুষ নবিজির সাথে কথা বলতে গেলে ভয়ে শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যেত। কিন্তু নবিজি তার সাথে কোমল আচরণ করতেন, তার ভয় দূর হয়ে যেত। সে স্বাচ্ছন্দ্যেই কথা বলতে পারত। নবিজি বলতেন, 'ভয় পেয়ো না, নিজেকে স্বাভাবিক রাখো। আমি তো কুরাইশ বংশেরই এক মায়ের গর্ভে জন্মেছি, যে কিনা শুকনো গোশত খেত আর সাধারণ জীবনযাপন করত।'[১]

নবিজির পর তার সাহাবিরাও ছিলেন বিনয় ও আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক।

আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কয়েকজন দরিদ্র প্রতিবেশী ছিল। তিনি তাদের বকরীর দুধ দোয়াতেন। কিন্তু যখন তিনি খলিফা হলেন, তখন প্রতিবেশীরা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। তারা ভাবল, আবু বকর এখন খলিফা, বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী। এই পদে সমাসীন হয়ে তিনি কীভাবে বকরীর দুধ দোয়াবেন? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যেদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব বুঝে নিলেন, সেদিনও প্রতিদিনের মতো প্রতিবেশীর দরজায় এসে কড়া নাড়লেন। অন্তঃপুর থেকে মা তার মেয়েকে বলল, দরজা খুলে দেখো, কে এসেছে। দরজা খুলতেই তো মেয়ের চোখ ছানাবড়া। সে মাকে ডেকে বলল, মা! তিনি আজও দুধ দোয়াতে এসেছেন![২]

বিনয়ের এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল!

আমাদের উচিত ফিতরাত (স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য) থেকেই আল্লাহকে উপলব্ধি করা। বোঝার চেষ্টা করা, কীভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলব, কীভাবে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করব এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কীভাবে তাকেই অগ্রাধিকার দেবো! কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফিতরাত থেকে আল্লাহকে চেনার উপায় কী?' জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন, 'তুমি বিষয়টি বুঝলে অবশ্যই তার উপায় খুঁজে পেতে।'

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৩১২

[২] *খুলাফাউ রাশিদিন*, মাহমুদ আহমাদ, পৃষ্ঠা : ৩০

লোকটি আবার বলল, 'আমি আপনার কথা বুঝিনি। যাকে আমি চিনি না, জানি না, তাঁর ইবাদত কীভাবে করব?

জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন, 'তুমি যাকে চেনো, তার অবাধ্য হও কীভাবে?'

অর্থাৎ, তুমি যদি চেনা মানুষের অবাধ্য হতে পারো, তাহলে অচেনা সত্তার আনুগত্য কেন করতে পারবে না? অথচ তোমার ফিতরাতের মধ্যেই আল্লাহর পরিচয়!

আল্লাহকে চেনার পরও মানুষ তাঁর নাফরমানি করে।

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কখন থেকে আল্লাহর অবাধ্য হননি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যখন থেকে আল্লাহকে চিনেছি তখন থেকে আর তাঁর অবাধ্য হইনি।'

আপনি দুনিয়ার সব জ্ঞান অর্জন করেছেন। জিন-ইনসানের সকল ইলম অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু এই ইলমের পিছনে আপনার নিয়ত ছিল, সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করা। তাই একান্তে, নির্জনে আল্লাহর অবাধ্য হতে আপনার বিবেক, ইলম, তাকওয়া আপনাকে বাধা দেয়নি। তাহলে জেনে রাখুন, আপনি আল্লাহকে চিনতে পারেননি।

আল্লাহর কসম! কারো ইলম যদি আল্লাহর নাফরমানি থেকে ফেরাতে না পারে, আল্লাহর কাছে সেই ইলমের বিন্দুমাত্র কদর নেই।

গুনাহ ছোট কি বড়—সেদিকে তাকাবেন না; আল্লাহর সামনে অবাধ্যতার যে দুঃসাহস আপনি দেখিয়েছেন তাতেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকুন। আল্লাহর শাস্তি নেমে আসার পূর্বেই তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হোন। তাওবা করুন একনিষ্ঠ চিত্তে।

ইসলামিক স্টাডিজে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেটধারী এক আলিমের কথা ধরা যাক। তিনি ধর্মীয় বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী; রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও একশো ছাড়িয়ে গেছে। মনে করুন এমন আলিমের ঘরে প্রবেশ করল কোনো বেপর্দা গায়ের মাহরাম নারী। আলিম সাহেব তার রূপ-লাবণ্য ও চেহারার জাদুতে মোহগ্রস্ত হলেন। তাকে দেখে চোখের যিনায় লিপ্ত হলেন, তার ইলম তাকে এই হারাম কাজ থেকে বিরত রাখতে পারল না। অপরদিকে তার বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়ানো ছিল এক অশিক্ষিত দারোয়ান। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ তার হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু আল-কুরআনের এই আয়াত সে তিলাওয়াত করেছে—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা কিছু করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।[১]

এ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশের কথা স্মরণ করে সে তার দৃষ্টি অবনত করেছে। তাহলে আল্লাহর কাছে সেই প্রকৃত আলিম। আর প্রথমোক্ত যে আলিম হারাম দৃষ্টি দ্বারা প্রবৃত্তির ক্ষুধা নিবারণ করেছে, আল্লাহর নিকট সে চরম মূর্খ।

মাসরুক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষের জন্য ইলম হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে। আর ইলম নিয়ে গর্ব করা, মানুষের মূর্খতার জন্য যথেষ্ট।'[২]

আল-আজিজ সত্তার সাথে বান্দার সম্পর্ক কেমন হবে?

যে মুমিন আল-আজিজের অর্থ অনুধাবন করেছে এবং এর মর্ম হৃদয়ে ধারণ করেছে, আল্লাহ ছাড়া সে অন্য কাউকে প্রকৃত সম্মান দিতে পারে না। মানুষের সাথে তার আচরণ অবশ্যই সুন্দর হবে; শ্রদ্ধাপূর্ণ হবে। কিন্তু কোনো সৃষ্টির জন্য সে প্রকৃত সম্মানের বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কোনো ধনীর সামনে নত হলো, তার দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ চলে গেল।[৩]

আপনি যখন কোনো ধনী ব্যক্তিকে তার ধন-সম্পদের কারণে সম্মান করলেন, তার সামনে মাথা নত করলেন, তখন আপনার ঈমানের এক-তৃতীয়াংশ বিদায় নিল। আর যখন তার গুণকীর্তন করলেন, তখন চলে গেল আপনার ঈমানের আরেক তৃতীয়াংশ। ধনী ব্যক্তির সামনে নত হতে গিয়ে এক মুহূর্তে হারিয়ে ফেললেন

---

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩০

[২] *সুনানু দারিমি* : ৩২১; *শুআবুল ঈমান* : ৭৩৪

[৩] *শুআবুল ঈমান* : ৮২৩২

মূল্যবান ঈমানের দুই-তৃতীয়াংশ। এজন্য নবিজি আরো বলেছেন, 'মুমিনের মর্যাদা রাত জেগে ইবাদতে এবং তার সম্মান মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী থাকায়।'[১]

মুমিন বিশ্বাস করে সে আল্লাহর বান্দা; আল্লাহ তাকে কখনোই ধ্বংস করবেন না; নিজের পরিচর্যা উঠিয়ে নিয়ে অন্য কারো হাতে তাকে সোপর্দ করবেন না।

মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব উদ্বেলিত হবে, সৃষ্টির সব কিছুই তখন তার কাছে নগণ্য ও হেয় মনে হবে। যার হৃদয়ে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব জায়গা পাবে না, আল্লাহর সৃষ্টিই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এ এক মহাপরীক্ষা। কত লোককে আপনি বলতে শুনবেন, 'অমুক এত বড় ক্ষমতার অধিকারী, তার শক্তি-সামর্থ্যের কোনো শেষ নেই, সে যা ইচ্ছা করে ফেলতে পারে।' আসলে আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রতাপের অনুভূতি তার অন্তরে নেই। সে আল্লাহকে চিনতে পারেনি। তাই আল্লাহর বিপরীতে সে আল্লাহর সৃষ্টিকে শক্তিধর মনে করে বসে আছে। যত দিন পর্যন্ত আপনি এই লোককে এমন ক্ষমতাধর মনে করবেন, তত দিন পর্যন্ত আপনি আল্লাহর পরিচয় থেকে বহুদূরে। আপনি আল্লাহকে চিনতে পারেননি। মানুষ তার ঈমানের পথে যত অগ্রসর হবে, যত বেশি ঈমানের উচ্চতায় উন্নীত হবে, তত বেশি সে আল্লাহমুখী হবে। আর যারা ঈমান থেকে ছিটকে পড়বে, তারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াবে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

যারা পরকালে আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিই।[২]

সম্মানদাতা একমাত্র আল্লাহই

আপনি যখন বিশ্বাস করেন আল্লাহ একমাত্র সম্মানদানকারী, তখন কী করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সম্মান আশা করতে পারেন? সমস্ত জিন-ইনসান এবং

[১] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহাহ* : ৮৩১

[২] সুরা ইউনুস, আয়াত : ১১

সমগ্র সৃষ্টি সংঘবদ্ধ হয়ে যদি আপনাকে কোনো মর্যাদায় উন্নীত করতে চায়, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কস্মিনকালেও তারা তা করতে পারবে না। আল্লাহ যদি আপনাকে মর্যাদার এক বা একাধিক স্তরে উন্নীত করতে চান, পৃথিবীর সকল শক্তি মিলেও আপনাকে সেই স্তর থেকে নামাতে পারবে না।

আপনি যত বেশি আল্লাহর অনুগত হবেন, তত বেশি তিনি আপনার সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। আর আপনার অনুভূতি ও কার্যকলাপ দ্বারা আল্লাহকে যত বেশি তুচ্ছজ্ঞান করবেন, আপনিও আল্লাহর কাছে তত বেশি হেয় আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন। বর্তমানে মুসলিমরা আল্লাহকে গুরুত্বহীন মনে করে, তাই তারাও আল্লাহর কাছে হীন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরুন এবং তাতে অটল অবিচল থাকুন, আশা করা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার সাথে বিশেষ অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করবেন। কিন্তু যখন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে সমষ্টিগতভাবে উম্মতের লোকেরা আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে তখন অবশ্যই আল্লাহ তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রদান করবেন।

এক দাপুটে হাজির করুণ পরিণতি

এক দাপুটে লোক ছিল। ভৃত্য, সেবক ও ভক্ত কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তার। তারা সবসময় তার সাথেই থাকত। লোকটি বাইতুল্লাহ গেল হজের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাওয়াফের মাঝখানেও সেবক-ভক্তরা তার সঙ্গ ছাড়েনি। তার সম্মানার্থে তাওয়াফের সময় সামনে থেকে লোকজন সরিয়ে পথ করে দিচ্ছিল। যাহোক, এভাবে লোকটি তাওয়াফ, সায়ি এবং হজের অন্যান্য কার্যক্রম সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসে।

ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে একবার আমি বাগদাদের একটি সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। আচমকা এক ভিক্ষুককে দেখে চমকে উঠলাম। তাকে দেখে মনে হলো আগে কোথাও দেখেছি। কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে আবিষ্কার করলাম, লোকটির চেহারা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় দেখা সেই লোকটির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে তার আগের বেশভূষা আর এখনকার বেশভূষার মাঝে আসমান-জমিন ফারাক! তখন সে ছিল বিরাট শান-শওকতের মাঝে। এখন সে রয়েছে খুবই শোচনীয় ও

দুরবস্থায়। দেখলাম সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করছে। হয়তো আমাকে দেখে সেও একটু-আধটু চিনতে পারছিল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলাম আমি। সে একটু এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? আপনি আমাকে এমন গভীরভাবে দেখছেন কেন?' আমি বললাম, 'আপনি কি সেই লোকটি নন, যার সাথে তাওয়াফের সময় দেখা হয়েছিল?' সে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।'

'কিন্তু আপনার এই দুরবস্থা হলো কী করে?'

'কারণ যেখানে মানুষ চরম বিনয় ও আনুগত্যের পরিচয় দেয়, সেখানে আমি অহংকার দেখিয়েছি। আল্লাহর ঘর তাওয়াফের সময় কোনো অহংকার চলে না। যত ধন-সম্পদের মালিক, যত ক্ষমতাধর অথবা যত বড় রাজাই হোক না কেন, সেখানে সবাই আল্লাহর বান্দা। তাই যে স্থানে মানুষ সম্মান-মর্যাদা ও গৌরবের সাথে চলাফেরা করে সে স্থানে আল্লাহ আমাকে নীচ বানিয়ে দিয়েছেন।'

মানুষ যখনই সামান্য পরিমাণ বড়ত্ব ও অহংকার প্রকাশ করে, সাথে সাথেই আল্লাহ তার বদলা দেন এবং তাকে সেই পরিমাণ নীচ ও অপদস্থ করে দেন।

আল্লাহ তাআলা সকল গুনাহ মাফ করে দেন, কিন্তু দুটি গুনাহ এমন রয়েছে যার শাস্তি আল্লাহ দিয়েই ছাড়েন। তাই এ দুটির ধারে-কাছেও যাবেন না—এক. আল্লাহর সাথে শিরক; ঔদ্ধত্য, অহংকার। দুই. মানুষের ক্ষতিসাধন অর্থাৎ জুলুম।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝

কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহরই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উচ্চে তুলে ধরে। আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।[১]

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ১০

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন—

...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

সম্মান ও শক্তি তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসুল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকরা এটা জানে না।[১]

উপরিউক্ত দুটি আয়াত পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। কারণ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সকল সম্মান ও ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, সম্মান ও ক্ষমতা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের। তাই বাহ্যত মনে হতে পারে আয়াত দুটি পরস্পর বিরোধী। কিন্তু বাস্তবে এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত সম্মান ও ক্ষমতার মালিক। আর নবি ও মুমিনগণ আল্লাহর পথে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্মান ও শক্তি অন্বেষণ করেন। আল্লাহই তাদের সম্মানিত করেন। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে গিয়ে সম্মান কামনা করেন, আল্লাহর বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করে মর্যাদা খুঁজে ফেরেন এবং আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা না করে অন্য কোনো পন্থায় সম্মান-মর্যাদা অন্বেষণ করেন, তাহলে আপনি মূলত হীন, নিকৃষ্ট।

আল্লাহর আনুগত্যে সম্মানিত যিনি

মিসরের শাসকের স্ত্রী। সে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রলুব্ধ করতে এবং কুপ্রস্তাবে রাজি করাতে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। এই হীন কর্মের কারণে এবং পরবর্তীতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে লাঞ্ছনার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল সে, যা একজন গোলামের জীবনের চেয়ে বেশি সুখকর ছিল না। আমাদের চারপাশে কত মানুষ দেখি যারা সম্মান-মর্যাদার উচ্চ শিখরে অবস্থান করত, কিন্তু যখন তারা আল্লাহর নাফরমানিতে সম্মান খুঁজতে শুরু করল, তিনি তাদেরকে অধঃপতনের সর্বনিম্ন গহ্বরে ছুড়ে ফেললেন।

মনিবের স্ত্রীর প্রস্তাবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাই আল্লাহ তাকে সম্মানের উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছেন। আল্লাহ বলেন—

[১] সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮

...قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন (কুপ্রস্তাবের জবাবে), আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তিনি আমার প্রভু। তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না।[১]

আলোর পথে প্রত্যাবর্তন

এখন আপনাদের যে গল্পটা শোনাব, তা এক দরিদ্র যুবকের। এটা এতই বিস্ময়কর একটি ঘটনা যে, তার মুখে না শুনলে আমি কখনো বিশ্বাসই করতাম না। দামেশকের এক গ্রামে যুবকটির ছোট্ট একটি বইয়ের দোকান ছিল। এটাই তার জীবিকা উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম। যুবকটি তখনো অবিবাহিত। যৌবনের তাড়নায় নিজেকে আর কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারছিল না সে। একদিন পাশের গ্রামের এক পতিতার সাথে তার দেখা হলো। মেয়েটা মিষ্টি কথা আর রূপ-লাবণ্যে যুবকের মন জয় করে নিল। খারাপ কাজে রাজি করিয়ে ফেলল মুহূর্তের মাঝে। যুবকটি তখন দোকানপাট সব বন্ধ করে মেয়েটার পেছন পেছন রওনা দিলো। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে যুবকটি হজ করেছে। হাঁটতে হাঁটতে তার হজের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! আমি আমার হজটিকে মাটি করতে পারব না।' যে-ই কথা সে-ই কাজ। সে ঐ মেয়েটিকে রেখে সোজা বাড়ি ফিরে আসে।

এই যুবক যা করেছে আল্লাহর ভয় এবং আনুগত্যের কারণেই করেছে। পরদিন সকালে সে আবার দোকান খুলে বসে। আশ্চর্যজনকভাবে সেদিন দোকানে এলো এলাকার নের্তৃস্থানীয় একজন ভদ্রলোক। এসেই জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বিয়ে করেছ?

যুবক উত্তর দিলো, জি না!

লোকটি বলল, 'বিয়ের উপযুক্ত একটি মেয়ে আছে আমার। তোমার পরিবারের লোকদের এসে দেখে যেতে বলো।' যুবক মনে মনে ভাবল, নিশ্চয়ই মেয়েটির কোনো সমস্যা আছে। তা না হলে বাবা নিজেই প্রস্তাব দেবে কেন?

---

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ২৩

বাড়ি ফিরে সে পরিবারের লোকদেরকে মেয়ের বাড়িতে পাঠাল। উদ্দেশ্য ছিল তারা গিয়ে পছন্দ হলে প্রস্তাব দিয়ে আসবে। মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছিল তাদের। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল।

এক মাস যেতে না যেতেই যুবকটির শ্বশুর তাকে ব্যাবসায়িক অংশীদার করে নেয়। চিন্তা করুন, গ্রামের সামান্য দোকানদার মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে কী বিস্ময়করভাবে!

সেই ভদ্রলোক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে বহু বছর হয়ে গেছে। কিন্তু যুবক আজ বড় বড় ব্যবসায়ীর সাথে বাণিজ্যিক পার্টনার হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছে। আল্লাহর আনুগত্যের কারণেই আল্লাহ তার নগদ বিনিময় দান করেছেন। একজন উম্মত হয়ে সে ইউসুফ আলাইহিস সালামের তাকওয়ার স্মৃতি জাগ্রত করেছিল। লাস্যময়ী নারীর আবেদনের সামনে যুবকটি উচ্চারণ করেছিল সেই অমর বাণী—

مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তিনি আমার রব। তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না।[১]

এভাবে দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি আচারে-উচ্চারণে আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। যেকোনো হারাম কাজের মুখোমুখি হলে আল্লাহর হুকুমের সামনে নত হোন। আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যের ফলে ধন-সম্পদ আপনার কাছে দ্বিগুণ, তিনগুণ, শতগুণ হয়ে আসতে থাকবে।

আল্লাহর জন্য যদি বান্দা কোনো কিছু বিসর্জন দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ অবশ্যই তার উত্তম বিনিময় দান করবেন। যত বেশি আপনি আল্লাহর অনুগত হবেন তত বেশি তিনি আপনাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে উন্নীত করবেন। যত বেশি আপনি তাঁর অবাধ্য হবেন, তত বেশি তিনি আপনাকে নিচে নামিয়ে দেবেন। আল্লাহকে যদি গুরুত্বহীন মনে করেন, তাহলে আপনিও আল্লাহর কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যাবেন। আর আপনি যদি তাঁকে ও তাঁর নির্দেশাবলিকে সম্মান প্রদর্শন করেন,

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ২৩

তিনি আপনার মান-সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। আপনার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বীজ বুনে দেবেন মানুষের হৃদয়ে।

বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ ইমামের কথাই ধরুন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ কিংবা ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ। আজও মজলিস, মাহফিল মোহিত হয় তাদের সুবাসিত নামের উচ্চারণে। জীবনভর তারা আল্লাহর আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন, এর বদৌলতে আল্লাহ তাদের ইতিহাস, স্মৃতিকে অমর করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে যা সভ্য সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলতে থাকবে। মুসা আলাইহিস সালাম সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু ফিরাউন নিমজ্জিত হয়েছে অপমান, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার অতলে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَابِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَابِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ۝

আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জিত হলো, তখন বলল, 'আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যার প্রতি বনি ইসরাইল বিশ্বাস স্থাপন করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' 'এখন! ইতঃপূর্বে তুমি তো অমান্য করেছ। আর তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আজ আমি তোমার দেহটি সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।'[১]

এভাবে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন ইবরাহিম, মুসা ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামকে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

নবি-রাসুলের অনুসারীরাও আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৯০-৯২

আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও সম্মানিত করেছেন। আবু বকর সিদ্দিক, উমার ফারুক, উসমান, আলি সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। কিন্তু আবু জাহল নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। কোথায় আজ আবু জাহল, আবু লাহাব, শায়বা, উতবাহ? আল্লাহ ও আল্লাহর নবির বিরুদ্ধাচরণে নের্তৃত্ব দানকারী সেই নেতারা আজ কোথায়?

আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা ইবনু আবি জাহল, এক সময়ের ইসলামের ঘোরতর শত্রু, আল্লাহর নবির শত্রু। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে ফিরে আসার দ্বারা ইতিহাস তাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছে? তার পিতা আবু জাহলের কুকীর্তিতে নাকি তার নিজের ঈমানি শক্তিতে?

আল্লাহর অবাধ্যতা আর হৃদয়ের কুটিলতা দ্বারা কখনো মর্যাদা অর্জন করা যায় না।

হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন করুন, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন। মানুষের ধন, মানুষের সম্মান সবকিছুই আপনার কাছে আমানত। আমানতের খিয়ানতের অধিকার আপনার নেই। কারো দরজার ফাঁকা দিয়ে, ছাদের ওপর থেকে কারো স্ত্রী বা কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি দিলেন, আপনি আপনার প্রতিবেশীর আমানতের খিয়ানত করলেন। আপনার হৃদয় হয়ে গেল দুর্গন্ধময়। আল্লাহর কাছে আপনি হয়ে গেলেন ঘৃণিত।

ঈমান হলো আত্মার পবিত্রতার নাম। মানুষের হাতে যে সম্পদ রয়েছে তাতে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্রতা। তাই দৃষ্টি অবনত করা ঈমানের মৌলিক ও জরুরি অনুষঙ্গ। একজন মুমিন কুপ্রবৃত্তির ঘোড়ায় দৌড়ানো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মানুষ যখন আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে অবনত করে, আল্লাহ তার জীবনে শান্তি, সম্মান ও স্বস্তি দান করেন। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের বন্ধন অটুট হয়। আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়ে তারা সুখময় জীবন লাভ করে।

সবাই চায় সম্মান পেতে, কিন্তু সম্মানের মূলধন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। তাই সম্মান-মর্যাদার সওদা বুঝে পেতে আগে আনুগত্যের মূল্য পরিশোধ করুন। বিশেষ করে যুবকদের বলি, হারাম থেকে বেঁচে থাকুন, হালাল এসে ধরা দেবে আপনার সামনে। আপনার হৃদয়-আত্মাকে কখনোই কোনো গুনাহের কল্পনা করার সুযোগ দেবেন না। আল্লাহই আপনার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ এমনভাবে আপনার রিযিকের পথ করে দেবেন, যার চিন্তাও কখনো আপনার মাথায় আসেনি। আপনি যদি আইনজীবী হয়ে থাকেন, মিথ্যা

বলা বন্ধ করুন। সত্য মামলা লড়ে এবং সত্যের ওপর থেকেই আল্লাহ আপনাকে আয়ের সুবন্দোবস্ত করে দেবেন। আপনি যদি ব্যবসায়ী হোন, মিথ্যা বলা ও ক্রেতা ঠকানোর অভ্যাস ত্যাগ করুন। সত্য কথা ও সততার প্রতি যত্নবান হোন, হালাল পথেই আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত লাভ।

কত মানুষ মারা যায় আর তাদের জানাযায় শরিক হয় দুই-তিনজন কিংবা হাতেগোনা কিছু মানুষ। এর চেয়ে অপমান আর কী হতে পারে? অথচ কোনো বড় আলিম মৃত্যুবরণ করলে জনতার ঢল নামে তার জানাযায়। আল্লাহই তাকে এই সম্মান দিয়েছেন। কারণ, সে আল্লাহকে সম্মান করেছে, আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা নত করেছে। আপনিও আল্লাহর বিধানকে সম্মান করুন, আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

বিকৃত মানসিকতার পাপিষ্ঠ কারো কাছে দেখলেন, অঢেল সম্পদ, অদম্য শক্তি; দেখলেন দুনিয়ার ভোগ-উপভোগের কোনো কিছুরই কমতি নেই তার। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটির অনুগত-অনুরক্ত হয়ে পড়লেন, ভেবে নিলেন তার আনুগত্য আপনাকে দুনিয়ার সব সুখ এনে দেবে। কিন্তু তার প্রতি ঝুঁকে আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, আল্লাহকে ভুলে গিয়েছেন। তাই আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এবং অপমানই হবে ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আপনার ভুলের সংশোধন।

মানুষের কাছে মানুষের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু তা হতে হবে নিজের আত্মপরিচয় ও মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে। মুমিন কখনো নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়ে কারো কাছ থেকে প্রয়োজন পূরণের আশা করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমরা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।[১]

---

[১] সূরা হুদ, আয়াত : ১১৩

আল-কারিম : اَلْكَرِيْمُ

মহানুভব, পরমদাতা

যদি আপনার ভেতরে বসবাস করে এমন একটি হৃদয়, যা উত্তম ভাবনা এবং মুসলিমদের কল্যাণ চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে, তাহলে এটা আল্লাহর কাছে মহৎ একটি গুণ। তিনি বান্দার মহৎ গুণাবলি ভালোবাসেন।

তিনি মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক গঠন দেখেন না। কে বেঁটে, কে লম্বা, কার চোখ বড়, কার চোখ ছোট, কার নাক উঁচু, কার চোখ কোটরে, কার ভ্রুদ্বয় আলাদা, কারটা যুক্ত, কার চোয়াল মসৃণ—এসবের প্রতি আল্লাহ লক্ষ করেন না। তিনি তো কারিম, মহানুভব; তাই মহৎ তাঁর দৃষ্টি।

☆☆☆

আল-কারিম। আরবি كرم (কারাম) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি; যার অর্থ মহানুভবতা, মহত্ত্ব। আরবি ভাষাবিদগণ বলেন, 'প্রত্যেকটি প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণই 'কারাম', এবং যে ব্যক্তি সেই গুণের অধিকারী সে 'কারিম'। মানুষ মনে করে শুধু বদান্যতা ও উদারতাই 'কারাম' শব্দের অর্থ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সকল উত্তম গুণের নাম।

অতএব, সহনশীলতা মহানুভবতা, বদান্যতা মহানুভবতা, অনুগ্রহ মহানুভবতা, ধৈর্য মহানুভবতা, আত্মমর্যাদাবোধও মহানুভবতা। এক কথায় মানুষ যতগুলো উত্তম ও মহৎ গুণাবলি দ্বারা নিজের জীবনকে শোভিত ও অলংকৃত করে তার সবগুলোর

সমষ্টি ও গোষ্ঠিগত নামই হলো মহানুভবতা।

মানুষকে কিছু দান করা বা শুধু বদান্যতার নামই মহানুভতা নয়; বরং সহনশীল ব্যক্তি মহানুভব, দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি মহানুভব, অকৃত্রিম ও খাঁটি লোক মহানুভব, মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি প্রেমময় ব্যক্তি মহানুভব, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি মহানুভব। আরবিতে মূল্যবান পাথরসমূহ, যেমন, হীরা, জহরত, মণি-মুক্তা—এগুলোকে 'হাজারুন কারিম' বলা হয়। অর্থাৎ মূল্যবান পাথর।

কারিমের আরো অনেক অর্থ রয়েছে—

সুশ্রী চেহারা ও আকর্ষণীয় শারীরিক গঠন বোঝাতে 'কারিম' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আজিজে মিসর-এর স্ত্রী ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুপ্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। রাজপ্রাসাদের নারীদের মধ্যে সমালোচনা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। আজিজে মিসর-এর স্ত্রী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সবাইকে দাওয়াত দিয়ে এক রাজকীয় ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নারীরা সকলে উপস্থিত হওয়ার পর সে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাদের সামনে পেশ করে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে তারা হতচকিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন—

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

স্ত্রী-লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল। তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিলো (তাদের আপ্যায়নে পরিবেশিত ফলমূল কেটে খাওয়ার জন্য) এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' তারা যখন তাকে দেখল, তখন তার গরিমায় অভিভূত হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলে উঠল, 'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়; এ তো কোনো সুদর্শন ফেরেশতা।[১]

বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্য বোঝাতেও কারিম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩১

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَام

অর্থাৎ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম অভিজাত বংশ-পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই একজন নবি, তার বাবা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, তার দাদা ইসহাক আলাইহিস সালাম, দাদার বাবা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম।[১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু জায়গায় জান্নাতকে 'আল-মাকামুল কারিম' আখ্যা দিয়েছেন। যেখানে নেই কোনো কষ্ট-ক্লেশ, ভয়-শঙ্কা; নেই কারো প্রতি কারো হিংসা-বিদ্বেষ। চিরশান্তির আবাসন—মাকামুন কারিম।

আল-কারিম শব্দের আরেকটি অর্থ প্রয়োজনীয় ও প্রিয় বস্তু। যাতে রয়েছে প্রচুর কল্যাণ; সকলেই তার মুখাপেক্ষী।

কুরআনকে বলা হয় কিতাবুন কারিম বা মহাগ্রন্থ। পূর্ণ কুরআনই মানবতার সমূহ কল্যাণ। দুনিয়া ও আখিরাতের আলোকবর্তিকা। তার প্রতিটি তত্ত্ব ও তথ্যই পরম বাস্তব এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য। বিশুদ্ধ শিক্ষা, দরদপূর্ণ উপদেশ, অনন্য দৃষ্টান্ত এবং মানবতার প্রতি হিতকামনায় পূর্ণ। তার সামনে বা পিছনে কোথাও বাতিল এসে ভিড়তে পারে না। তাতে নেই কোনো ধরনের আজগুবি বা মিথ্যার পসরা। ত্রুটি, অসংলগ্নতা বা বৈপরীত্যের লেশমাত্র নেই কুরআনুল কারিমে। সর্বদিক থেকে পূর্ণ ও নিখুঁত গুণবিশিষ্ট মহাগ্রন্থই আল কুরআনুল কারিম।

আরবরা তাদের মূল্যবান সম্পদকে ডাকে 'কারিম' বলে। মরু-জাহাজ উট, বিস্তীর্ণ মরুখণ্ডের উত্তপ্ত বালুতে সফরের একমাত্র অবলম্বন। উটই বালুসমুদ্রের মাঝ দিয়ে আরোহীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবার পিপাসার মুহূর্তে দেয় নির্মল, স্বচ্ছ দুধ। তাই মরুর দুলালদের নিকট 'মরুজাহাজে'র গুরুত্ব কোনোভাবেই সমুদ্র-জাহাজ থেকে কম নয়। এজন্য খুব আদর করে তারা উটকে স্মরণ করে 'নাকাতুন কারিমা' বলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণের সময় যেসব নসিহত করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল, 'যাকাত উসুলের ক্ষেত্রে মানুষের অতি মূল্যবান সম্পদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।' অর্থাৎ মধ্যম প্রকৃতির সম্পদ গ্রহণ করবে। বেছে বেছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উটগুলো যাকাতের নামে কেড়ে নেওয়া যাবে না। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৩৮২

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মূল্যবান সম্পদকে 'কারিম' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আঙুর খুবই উপকারী ও সুস্বাদু ফল। দৃষ্টিনন্দন থোকায় ঝুলে থাকা পাকা আঙুর অনেকের প্রিয় ফল। তাই আঙুরকে বলা হয় 'কারাম'।

উত্তম আখলাক-চরিত্র, মার্জিত ও শ্লীল আচরণ-অভ্যাসকে বলা হয় 'মাকারিমুল আখলাক'।

মোটকথা, কারিম শব্দটি খুবই অর্থবহ এবং সমগ্র উত্তম গুণাবলির সমাহার। অতএব, কারিম শব্দটি যখন ব্যবহৃত হবে আল্লাহর নামে, তখন তার অর্থ হবে ঐ মহান সত্তা; যিনি সকল উত্তম ও মহৎ গুণাবলির আধার। আল কুরআনকে যখন বলা হবে কারিম, তখন তার অর্থ হবে, মহান আল্লাহ কর্তৃক মানবতার কল্যাণে অবতীর্ণ, তাঁর পবিত্র বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞

হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল?[১]

অর্থাৎ মহান রবের ব্যাপারে তোমাকে কীসে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে? আল্লাহর ব্যাপারে কি মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে? অথচ এমন মহান সত্তার ব্যাপারে ধোঁকায় নিপতিত হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

আপনি কারো ওপর জুলুম করলেন। আদালতে আপনার নামে মামলা হলো। আপনি জানেন যে, আপনি অপরাধী। তারপরও মামলা নিজের অনুকূলে আনার জন্য জজকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিলেন, আর মামলা জিতেও নিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী হলো? আপনি ঐ জজের বাহ্যিক সততায় ধোঁকা খেলেন। আপনি ভাবলেন, সে তো উপকারই করেছে। আল্লাহর হুকুম ছুড়ে ফেলে আপনি যে কাজ করলেন, এতে আপনি আসলে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা খেয়েছেন। আপনি আল্লাহকে চিনতে পারেননি। আপনি ভেবে নিয়েছেন আল্লাহ আপনার জন্য যে ফয়সালা করেছেন তা ন্যায়সংগত। আসলে আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেননি, আপনি আল্লাহকে

---

[১] সুরা ইনফিতার, আয়াত : ৬

দুর্বল মনে করেছেন। আপনার এই একটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত, অনুগ্রহ, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে নাকচ করে দিলেন। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের কখনো ভুলে যান না? তাঁর আনুগত্যে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের তিনি জাহান্নামের আগুনে দেবেন না। আপনি কি ভুলে গেছেন, যারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তিনি তাদেরকে জান্নাত দেবেন না? আপনি আল্লাহকে ভুল বুঝেছেন। আল্লাহর ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাপূর্ণ ধারণা করে বসে আছেন। আপনি ধোঁকায় নিপতিত হয়েছেন আপনার রবের ব্যাপারে!

বান্দার প্রতি মহান রবের মহানুভবতা

আপনার অফিসে চাকুরি করে একজন কর্মচারী। সে তার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করে আপনার কাজ করে দেয়। আপনি তার ওপর খুশি হয়ে এই নিষ্ঠার প্রতিদান হিসেবে তাকে উপহার দেন। আপনি তার কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন বলেই তাকে উপহার দিয়েছেন। কোনো বিনিময় ছাড়া, আপনার কোনো কাজ করে দেওয়া ছাড়া এমনি এমনি তাকে প্রতিদান দেননি। তবুও সমাজের লোক আপনাকে মহানুভব, উদার বলেই চিনবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারিম, মহানুভব হলেন আল্লাহ। তিনি মানুষকে নিয়ামতে ভরিয়ে দেন কোনো বিনিময় ছাড়াই। তিনি আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন, পরম যত্নে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এতে আমাদের কোনো আবেদন বা আবদার ছিল না। আবেদন, নিবেদন ছাড়াই নিজ অনুগ্রহে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন আমাদের জীবন। এতে আমাদের কোনো হক ছিল না।

বান্দার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি উদার ও মহানুভব। আপনি কারো সাথে কোনো ভুল করে ফেললেন। ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন। সে ক্ষমা করে দিলো। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সে বলে ফেলবে, 'ভুলে যেয়ো না, তুমি কিন্তু এমন একটা কাজ করেছিলে!' এরপর সপ্তাহ খানেক হয়তো আপনি স্বস্তিতে থাকবেন। সে আবার বলবে, 'তুমি কিন্তু একবার এমন একটা কাজ করেছিলে।' তখন বিরক্তি চেপে রেখে আপনিও বলতে বাধ্য হন, 'হ্যাঁ! তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।' এভাবেই যখন-তখন সে আপনার ভুলত্রুটি মনে করিয়ে দিতে পারে।

তাই রাব্বে কারিমের কাছে দুহাত তুলে দুআ করুন—'আল্লাহুম্মা আনতা আফুউউন কারিম!'

আপনার দুআ শেষ হতে না হতেই তিনি তাঁর মহান ক্ষমার চাদরে আপনাকে আবৃত করবেন। তাঁর ক্ষমা মানুষের ক্ষমার মতো নয় যে, বারবার মনে করিয়ে আপনাকে খোঁটা দেবেন। ক্ষমা প্রার্থনার কারণে শুধু আপনার অপরাধের মার্জনাই করা হবে না; বরং দুনিয়াতে যেন মানুষ আপনার পাপের কথা চর্চা করতে না পারে, সেজন্য মানুষের অন্তর থেকেও সেটা ভুলিয়ে দেন।

বান্দা যখন নিষ্ঠা ও অনুশোচনার সাথে আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা সকলের অন্তর থেকে তা ভুলিয়ে দেন। আমলনামা লেখায় দায়িত্বরত ফেরেশতা এবং অন্যান্য ফেরেশতাকে তা ভুলিয়ে দেন। জমিনের প্রতিটি স্থানকেই তার গুনাহের কথা ভুলিয়ে দেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তাকে তার নিজ গুনাহের কথা ভুলিয়ে দেন। মুমিন বান্দার মধ্যেও কখনো কখনো মূর্খতা বিদ্যমান থাকে কিন্তু আল্লাহ তাকে সে কথা ভুলিয়ে রাখেন, এতে সে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে।

আপনি হাজার বার কারো উপকার করলেন। কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবেই আপনার অধঃপতন হলো। দেখবেন সেই লোকটি আপনার অগণিত উপকারের কথা ভুলে গিয়ে ঐ পতনটাকেই আঁকড়ে ধরবে। খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মানুষের সামনে প্রচার করে বেড়াবে, আপনাকে হেয় করবে। অথচ আপনার হাজারো ভালো কাজের সামনে এই সামান্য বিচ্যুতি নিতান্তই নগণ্য। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে খারাপ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাই। যে অন্যের গুণ দেখলে লুকিয়ে ফেলে আর দোষ পেলে প্রচার করে বেড়ায়। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই খারাপ শাসক থেকে, যে আমার ভালো কাজে সৌজন্যবোধ ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয় না এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা ক্ষমা করে না।'[১]

অথচ আল্লাহ তাআলা পাপ ক্ষমা করে দেন, দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন। তাই মানুষ শত ভুলত্রুটি ও পাপ করা সত্ত্বেও জনসম্মুখে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াতে পারে। কোনো এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি একবার বলেছিলেন, 'মানুষ যদি আমার বদভ্যাস ও পাপ সম্পর্কে

---

[১] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহাহ*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৩৭৭

জানত, তাহলে তারা আমার দিকে ফিরেও তাকাত না। আমার থেকে দূরে সরে যেত এবং আমার সান্নিধ্যকে বিরক্তিকর মনে করত।'

আল্লাহ কত মহান যে, তিনি বান্দার দোষত্রুটি আড়াল করে দিয়েছেন। মানুষও মানুষের দোষ লুকায়। কিন্তু ঠিকই কানে কানে ফিসফিস করে, 'জানো, অমুক লোকটা কিন্তু এই এই অপরাধ করেছে।' কিন্তু আল্লাহ বান্দার পাপকে উপেক্ষা করবেন। উপেক্ষা করার অর্থ না জানা নয়; বরং তিনি বান্দার পাপ সম্পর্কে জানার পরও তা এড়িয়ে যান।

বলা হয়েছে—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

আপনি কখনো মনে করবেন না, জালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। তবে তিনি তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। [১]

নবিজিও ছিলেন কারিম, উদারচিত্ত, মহানুভব। কারিম মূলত আল্লাহর গুণ। যারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, তাদের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা নিজ গুণের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তখন মানুষকেও বলা হয় কারিম। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর এই মহান গুণ নিজেদের চরিত্রে ধারণ করে তারা মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। উত্তম পদ্ধতিতে এড়িয়ে যায়।

আর নীচ প্রকৃতির লোকেরা মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে। পান থেকে চুন খসতেই চোখ রাঙানি দেয়। মানুষের চলার পথ সংকীর্ণ করে তোলে। কারণে অকারণে অন্যকে লজ্জা দেয়। কিন্তু মুমিন কখনো অশ্লীল হয় না, কারো দোষচর্চা করে না এবং কাউকে গালি দেয় না। কারণ মুমিন তো মহানুভব, উদার মনের অধিকারী।

মহান আল্লাহই প্রকৃত মহানুভব, কারিম। তাই বান্দা যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তিনি বান্দাকে তার অসংখ্য গুনাহ, বদঅভ্যাস এবং লজ্জাজনক কাজগুলো স্মরণ

[১] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪২

করিয়ে দেন না। বরং বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

একবার আমি দামেশকের একটি উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যাই। পাহাড়টি অনেক উঁচু। সেখানে অনেক ঘরবাড়িও রয়েছে। প্রায় ৫০ লাখ মানুষের বসবাস। আমার মনে হলো, এসব বাড়িঘর কত উঁচুতে! এখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয় নাকি তাঁর নাফরমানি করা হয়—সে কথা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। তারপরও আল্লাহ তাদেরকে অগণিত রিযিক দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কারিম, মহানুভব; তাই বান্দা সামান্য ইবাদত নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হলেও আল্লাহ তাকে অঢেল পুরস্কার দান করেন।

কোনো মানুষ আরেকজনকে এক লোকমা খাবার খাওয়াল। এই এক লোকমা খাবারই কিয়ামতের দিন উহুদ পাহাড়ের মতো বিশাল হয়ে উঠবে। আল্লাহ তাআলা এক লোকমার বদৌলতে তাকে উহুদ পাহাড়ের সমান বিনিময় দেবেন। পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রের আইন কি এমন আছে যে, কেউ কাউকে এক টাকা দিয়ে বিনিময়ে পাঁচ বিলিয়ন নেবে? কিন্তু আখিরাতে আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি দান করবেন মুমিন বান্দাদেরকে। আপনি কাউকে সামান্য কিছু দিলেন, সামান্য ইবাদত নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হলেন, আপনার সম্পদের যৎসামান্যই আল্লাহর পথে ব্যয় করলেন কিংবা একটু সবরের মাধ্যমে আপনার কুপ্রবৃত্তি অবদমিত করে রাখলেন—এই এতটুকুর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে দেবেন বিশাল জান্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।[১]

এই নগণ্য, দুর্বল ও অধম বান্দাকে তিনি সম্মান দিয়ে বলেছেন—

...وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৩

তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো, আমি তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আর তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো।[১]

আমাদের আসলেই কি কোনো প্রতিশ্রুতি রয়েছে? আল্লাহর সাথে আমাদের কি কোনো তুলনা চলে? তবুও আল্লাহ তাআলা কত মহান! তিনি আমাদের সমকক্ষ সাথির মতো করেই সম্বোধন করেছেন। এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর মহত্ত্বের প্রকাশ।

আল কুরআনের বহু স্থানে তিনি আমাদেরকে আদেশ প্রদানের সাথে সাথে সেই আদেশের কারণ ও হেতুও উল্লেখ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা বস্তুত তিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন। যেমন—

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

আপনি তিলাওয়াত করুন কিতাব থেকে, যা আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম করুন। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।[২]

আমরা আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাদের শুধু সালাতের আদেশ প্রদান করেই কথা শেষ করে দিতে পারতেন। কিন্তু নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি তিনি এই নির্দেশের অন্তর্নিহিত হেতুও আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। এতে তিনি আমাদের প্রতি মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন।

কোনো শক্তিধর লোক দুর্বল কাউকে কোনো আদেশ করলে, 'এই কাজটি করো' জাতীয় আদেশ করেই ক্ষান্ত হন। কোনো কারণ দর্শানোর গরজবোধ করেন না। কারণ সে নিজেকে ভাবে সম্মানিত, শক্তিধর। তার আদেশ মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া দুর্বলের আর কোনো পথ নেই। কিন্তু আল্লাহ এত মহান হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে আদেশ করার সময় কারণ বর্ণনা করেছেন। আরো বর্ণিত হয়েছে—

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৪০

[২] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৫

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

আপনি তাদের সম্পদের যাকাত গ্রহণ করুন। এই যাকাত তাদের সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। কারণ আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।[২]

তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতির স্থল এবং ভালোবাসার পাত্র বানিয়েও সম্মানিত করেছেন। অথচ আমাদের মধ্যে তার ভালোবাসার পাত্র হওয়ার কী-ই বা যোগ্যতা রয়েছে? আল্লাহ বলেন—

...يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ... ﴿٥٤﴾

তিনি তাদের ভালোবাসেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।[৩]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করে দেবেন ভালোবাসা।[৪]

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১০৩

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩

[৩] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৫৪

[৪] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৯৬

আল্লাহ পুরো দুনিয়াটাই দিয়ে দিয়েছেন আমাদের।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

সেই সুমহান সত্তা, যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং সেটাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।[১]

লক্ষ্য

আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। মানুষের জীবন বাঁচানোর সবচেয়ে জরুরি জিনিস অক্সিজেনকে আল্লাহ সহজলভ্য করে দিয়েছেন। আপনি যেখানেই থাকুন, যেখানেই যান, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে কোনো মানা নেই। এই যে বাজার থেকে আপেল, আঙুর, কমলা কিনছেন, ব্যবসায়ী বা কৃষককে প্রতি কেজির মূল্য দিচ্ছেন। কিন্তু আসলেই কি আপনি আপেলের মূল্য দিচ্ছেন? আপেলের মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা কি মানুষের আছে?

কৃষক বা ব্যবসায়ীকে যে মূল্য দেওয়া হচ্ছে তা মূলত সেবা ও শ্রমের মূল্য। কৃষক অতি যত্নের সাথে ফলের চাষ করেছে। সময়মতো পানি সেচ ও পরিচর্যা করে বড় করেছে এবং পরিপক্ব হওয়ার পর জমিন থেকে ফল তুলেছে। গুদামজাত ও সংরক্ষণ করেছে। এরপর গাড়িতে করে আপনার সামনে এনে হাজির করেছে। তাই ফল ক্রয়ের সময় আপনি প্রতি কেজির যে মূল্য দিচ্ছেন তা মূলত তাদের এইসব শ্রমের মূল্যায়ন। আর যে আপেল আপনি ক্রয় করলেন তা এক অমূল্য বস্তু; তার কোনো মূল্যই হতে পারে না। সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাদান। একইভাবে শুধু দুনিয়া নয়; তিনি আখিরাতেরও মালিক বানিয়েছেন মুমিনদের।

দুনিয়াতে এমন মানুষ আপনার খুব কমই মিলবে, যে অনুগ্রহ প্রদর্শনের পর আর কখনো তার স্মৃতিচারণ করবে না। যদি কখনো আপনার ওপর রহম করে থাকে, আপনার ওপর তার কোনো অবদান থেকে থাকে, বারবারই সে তার স্মৃতিচারণ

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৯

করবে। আমি তোমার জন্য অনেক কিছু করেছি, তোমার তখন কোনো উপায় ছিল না; আমিই তোমাকে রক্ষা করেছি ইত্যাদি নানাভাবে আপনাকে খোঁটা দিতে থাকবে। খোঁটা না দিলেও সেসবের স্মৃতিচারণ তো অবশ্যই করবে। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে কত কিছু দান করেন, তিনি কখনো খোঁটা দেন না। তিনি অনুগ্রহের বিনিময়ে বান্দাকে কোনো ধরনের পেরেশানিতেও ফেলেন না।

কিন্তু কোনো মানুষের কাছ থেকে অনুদান নিতে গেলে সে আপনার নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছাড়বে। দরখাস্ত জমা দাও, জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে এসো, দুদিন পরে এসো, আমরা বিষয়টি দেখছি ইত্যাদি নানা ধরনের দৌড়াদৌড়িতে আপনাকে ক্লান্ত বানিয়ে ছাড়ে। কিন্তু মহান আল্লাহ আপনার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন, আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। এতে কোনো দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন দান করেন, তখন অঢেল দান করেন। যখন তাঁর নাফরমানি করা হয়, তখনো তিনি উদারতার পরিচয় দেন। তিনি এতই মহানুভব যে, পাপী বান্দাকেও তার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হতে দেন না। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

বলুন, ‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

তিনি কারিম তাই কারো আশা-প্রত্যাশা তাঁর কাছে অবহেলিত হয় না। আপনার কাছে একজন মানুষ এসে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে তার প্রয়োজন পেশ করল। চোখের পানিতে গাল ভিজিয়ে ফেলল। কিন্তু আপনার পাষাণ হৃদয়ে কোনো মমতার উদ্রেক হলো না। আপনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বলুন সে কি আর আপনাকে তার ভালোবাসার তালিকায় রাখবে? তার কল্পনার দর্পণে কখনো যদি আপনি ভেসে ওঠেন, তবে উঠবেন একটা পাষণ্ডর আকৃতিতে। কারণ এমন অসহায়ত্ব ও মিনতি প্রকাশ করা সত্ত্বেও আপনি তার সামান্য আশাকে পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়; বরং আপনি নির্দয়ের মতো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৫৩

হয়তো আপনিই কারো কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করলেন। সে আপনাকে ফিরিয়ে দিলো না ঠিকই; কিন্তু পরবর্তীতে জনসম্মুখে সে আপনাকে লাঞ্ছিত করবে। খোঁটা দিয়ে না হলেও, অনুগ্রহের স্মৃতিচারণ করে আপনাকে বিব্রত করবে। যারা দুয়েকবার মানুষকে উপকার করে থাকে—তাদের এমন আচরণ আপনি অহরহই দেখতে পাবেন।

কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর সম্মুখে তার প্রয়োজন তুলে ধরে, চোখের পানি ঝরিয়ে বিনয়াবনত মস্তকে তাঁর কাছে আবেদন করে, আল্লাহ কি কখনো তাকে ফিরিয়ে দেন? চোখ থেকে বেয়ে পড়া তপ্ত অশ্রুকে অবমূল্যায়ন করেন? কখনোই না। মহান আল্লাহ তো সকলের আশা-প্রত্যাশার বিশ্বস্ত ঠিকানা, চাওয়া-পাওয়ার পরম আশ্রয়। তিনি সর্বদাই অনুগ্রহ ও দানের শিশিরে সিক্ত করেন বান্দার জীবন। তিনি মহাশক্তিধর, উদারহস্ত। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই খরচ করেন।

তিনি অত্যন্ত মহানুভব ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তাই বান্দা যখন তাঁর সম্মুখে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করে, দু-চোখের অশ্রু ঝরায়, হৃদয়ের সব কলুষতা থেকে পবিত্র হয়ে বিনয় ও কোমলতার সুরে তাঁকে ডাকে—তিনি ঐ হাত দুটিকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

মানুষ চাওয়ার কারণে বিরক্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির ওপর ক্রোধান্বিত হন, যে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে না।

আল্লাহ তাআলা মহানুভব, তাই তিনি উত্তম চরিত্র ও মহৎ গুণাবলিকে অত্যধিক ভালোবাসেন। আর হীন স্বভাবকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন।

আপনি যদি সদা সর্বদা অনর্থক কাজ-কর্ম ও অশ্লীল ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকেন, অন্য কারো হকের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু স্বার্থপরের মতো জীবনযাপন করেন—এতে মূলত আপনি নিজের চারিত্রিক হীনতা ও মানবিক অধঃপতনেরই পরিচয় প্রকাশ করছেন। আল্লাহর কাছে এ ধরনের স্বভাব ঘৃণ্য।

যদি আপনার ভেতরে বসবাস করে এমন একটি হৃদয়, যা উত্তম ভাবনা এবং মুসলিমদের কল্যাণ চিন্তায় বিভোর থাকে, তাহলে এটা আল্লাহর কাছে মহৎ গুণ। তিনি ভালোবাসেন মহৎ গুণকে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরত, দেহকান্তি এবং সম্পদের প্রতি লক্ষ করেন না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।'[১] মানুষের অন্তরই আল্লাহর দৃষ্টিপাতের প্রধান স্থান।

মানুষ সম্পদশালী ও দাপটের অধিকারী ব্যক্তির কাছে যায়। আল্লাহর সম্পদ ও প্রতাপের সাথে ঐ ব্যক্তির দাপটের কোনো তুলনাই চলে না। সে নগণ্য, দুর্বল ও নীচ স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার সামনে অবনত হয়। অনেক অনুনয়-বিনয় করে, চোখের পানি ফেলে তার কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে। অথচ সে প্রায়ই কিছু না দিয়ে মানুষকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পেশ করলে তা কখনো অপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে দেন না। শুধু তা-ই নয়, তিনি এত বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে, অন্যের কাছে প্রয়োজন পেশ করা, অন্য কারো সামনে মাথা নত করাকে একদমই পছন্দ করেন না।

বিপদে-আপদে, দুরবস্থা-সংকটে যারা তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তাদের অবজ্ঞা করেন না। পরম করুণা ও ভালোবাসায় টেনে নেন নিরাপদ আশ্রয়ে।

তাই কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখুন। তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। জীবনের আশা-ভরসা, চাওয়া-পাওয়া সবকিছুকে তাঁর সাথেই জুড়ে দিন। মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার কথা ভুলে যান। জীবনের কোনো কিছুকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত থাকুন।

মহান ব্যক্তি অটুট রাখে সম্পর্ক

মহৎ লোক কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করে না। আপনি তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটালেও সে সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে দেয়। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সে আপনাকে দেখতে আসবে; সেবা-শুশ্রূষা করবে। আপনি কোনো সফর থেকে ফিরলে সে আপনার সাক্ষাতে আসবে। আপনি অর্থনৈতিক সংকট বা অসচ্ছলতায় পতিত হলে সে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি চাওয়া ব্যতিরেকে সে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবে। কারিম বা মহৎ লোক তো সে-ই, যে প্রার্থনা ছাড়াই প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৬৪

আপনার একজন ভাই আছেন, আত্মমর্যাদাবোধ এবং সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন। লোকে তাকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক অভাব দেখা দিলো। আপনি তখন বেশ সচ্ছল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে যথেষ্ট ফুর্তিতেই দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু আপনার ভাই অভাব-দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও চরম আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আপনার কাছে প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারে না। আপনি যদি তার চাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন, তাহলে আপনি তার ওপর জুলুম করলেন।

অপরদিকে মহানুভব আল্লাহর কথা ভেবে দেখুন। অনেক সাধারণ মানুষ রয়েছে যারা অভাবী, হতদরিদ্র। তাদের কাজকর্ম কথা-বার্তা সবই অমার্জিত। দ্বীন-ধর্মের পথ থেকে বহুদূরে। আবার সালাতেরও ধার ধারে না। কিন্তু আল্লাহ কি তাদেরকে বর্জন করেন? তাদের রিযিক বন্ধ করে দেন? না, বরং কখনো কখনো আল্লাহ তাদের সম্মানিতও করেন। তাদের সংকট দূর করে দেন। ঘুমের ঘোরে তাকে উত্তম কিছুর স্বপ্ন দেখান। ঘুম থেকে জেগেই সে জীবনের মোড় পরিবর্তন করে ফেলে। সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ তার সাথে নতুন করে সম্পর্ক জুড়েছেন।

'আল-কারিম' থেকে বান্দার জন্য শিক্ষা

প্রকৃত কারিম ও মহানুভব আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বান্দার মহানুভবতা তুলনামূলক ও আপেক্ষিক। আল্লাহই শুধু এমন সত্তা যিনি নাছোড়বান্দা মুমিনদের প্রার্থনা খুব ভালোবাসেন। ওদিকে দুনিয়ায় একজন মানুষও পাওয়া যাবে না, যার পেছনে কেউ পড়ে থাকলে সে খুশি হবে!

কারিম বা মহৎ হওয়ার শর্তই হলো, দুর্ব্যবহারকারীদের ক্ষমা করে দেওয়া এবং সমগ্র মানুষ ও বিশ্ব মানবতার প্রতি নিজের অবদান ও কল্যাণ পৌঁছে দেওয়া।

পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলোর দিকে লক্ষ করুন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, নানা ধরনের খাদ্য-সামগ্রী এবং সীমাহীন নাগরিক সুবিধার মধ্যে তারা অতি উন্নত জীবনযাপন করছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা পৃথিবীর সব সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করছে। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখায় ভিন্ন চিত্র। যে প্রশাসন তাদেরকে এই উন্নত নাগরিক সভ্যতা সরবরাহ করছে, সে বা তারা মূলত অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল ভিত্তিই হলো অন্যান্য

জাতি-গোষ্ঠিকে নির্দয়ভাবে শোষণ। তাদের নাগরিক সুবিধা ও জীবন-মানের প্রয়োজন মানেই হলো—জোরপূর্বক দুর্বল জাতি-গোষ্ঠির অর্থ চুরি ও তাদের সম্পদ ছিনতাই। তারা নিজেদের মুক্তমনা, উদারচিত্ত, মহানুভব যত ভূষণে ভূষিত করুক না কেন, তারা কখনোই মহানুভব হতে পারে না। স্বার্থান্ধ, শোষক, দাম্ভিক কখনো মহৎ হতে পারে না।

আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত কারিম ও মহৎ হতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনার অবদান, অনুগ্রহ, কল্যাণ মানবজাতিকে অতিক্রম করে প্রাণীদেরও ছুঁয়ে যায়।

পোল্ট্রিফার্মের মুরগির ছানাগুলোও আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা যখন দেখে তাদের দেশে মুরগির উৎপাদন দেশের খাদ্য-চাহিদার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে, তখন সেগুলো নির্দয়ভাবে আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে। তাদের উন্নত সভ্যতা আর উচ্চ শিক্ষা এমনটাই তাদের শিখিয়েছে। কোনো মুসলিম কখনো কি এমন কাজ করতে পারে? কী অপরাধ ঐ মুরগির বাচ্চাগুলোর? কেন ওদের বড় হতে দেওয়া হলো না? বড় হওয়ার পর আপনি সেগুলো আল্লাহর নামে জবাই করে খেতে পারেন, মাংস অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন কিংবা খাদ্যসংকটে থাকা তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এর কারণে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। কিন্তু আপনি আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবেন—এটা কোন ধরনের সভ্যতা? এমন হীন কাজ করে কেউ মহান হতে পারে?

আপনি কারিম এবং মহাত্মার অধিকারী তখনই হতে পারবেন, যখন আপনার অবদান, আপনার সদাচরণ, আপনার কল্যাণ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এবং সমগ্র সৃষ্টিকেই ছুঁয়ে যাবে।

একটি ব্যাপারে আল্লাহর শপথ করেই আপনাকে অনুরোধ করছি—কখনো কোনো অমুসলিমের সাথে অনর্থক দুর্ব্যবহার করবেন না। কেননা একজন অগ্নিপূজক, পৌত্তলিক বা নাস্তিকের সাথে দুর্ব্যবহারের কুপ্রভাব একজন মুসলিমের সাথে দুর্ব্যবহারের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। একজন ধর্মবিদ্বেষী বা বিধর্মী ইসলামকে জানার সুযোগ পায় মুসলিমদের আচার-ব্যবহার ও মার্জিত সামাজিকতায়। আর আপনার দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি তাকে ইসলাম থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিলেন।

মানব-সন্তানদের মধ্যে মহানুভব ও মহাত্মা সে-ই, যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তাদের দোষত্রুটি ঢেকে দেয়, প্রতিশোধপ্রবণতা বর্জন করে এবং দান-দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহ-উপহারে তাদের ভরিয়ে দেয়।

স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা মহানুভবতার পরিচয়

এক লোকের কাছে একবার খুবই আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা শুনি। সে তার বাসার ময়লা-আবর্জনার ব্যাগ ডাস্টবিনে ফেলতে গিয়েছিল। সেখানে সে একটা ব্যাগ দেখল, যার মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ভয়ে ভয়ে ব্যাগটার মুখ খুলতেই দেখা মিলল এক ফুটফুটে নবজাতকের। যতদূর ধারণা করা যায়, বাচ্চাটিকে সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা আগে ফেলে রাখা হয়েছে। সে বাচ্চাটিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেল। উষ্ণতার প্রয়োজনে তাকে ইনকিউবেটরে রাখা হলো কিছুক্ষণ। এরপর তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল লোকটি।

আপন সন্তানের মতোই সে পরিচর্যা শুরু করছিল বাচ্চাটির। একটু বড় হওয়ার পর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলো। আমি তার কাছে শুনেছিলাম যে, প্রাইমারি, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সে বাচ্চাটিকে অতি যত্নের সাথে লালন-পালন করেছিল সে। ছেলেটিকে মানুষ করতে কোনো কমতি রাখা হয়নি তার পক্ষ থেকে। এখন এই সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলেটি নিজের গাড়ি হাকিয়ে কোথাও যাওয়ার পথে পালক বাবার সাথে দেখা হলো। তিনি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করলে ছেলেটি যদি কিছুক্ষণ ভেবে, মাথা চুলকে দ্বিধান্বিত হয়ে শেষমেষ রাজি হয় বিষয়টা কেমন হবে? পালক বাবাকে সামান্য সাহায্য করতে এত চিন্তা করলে নিশ্চয়ই সেটা অকৃতজ্ঞতাই মনে হবে!

একজন মানুষের অনুগ্রহের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা না দেখানো যদি অপরাধ হয়, তাহলে সমগ্র জগৎসমূহের স্রষ্টা যিনি, তার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া বা কালক্ষেপণ করা কতটা গুরুতর অপরাধ হবে?

সাহাবিদের জীবনী থেকে চমকপ্রদ একটি ঘটনা শুনুন। মূতার যুদ্ধ। যায়েদ ইবনুল হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। শত্রুপক্ষে ছিল দুই লক্ষ খ্রিস্টান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে তিন জন আমির নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। যখন উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ লেগে যায় তখন

আল্লাহ তাআলা যুদ্ধক্ষেত্র নবিজির সামনে তুলে ধরেন। তিনি সাহাবিদের কাছে যুদ্ধের বর্ণনা দিতে থাকেন। নবিজি বলেন, এখন পতাকা গ্রহণ করেছে যায়েদ। সে জিহাদ করতে করতে শহিদ হয়ে গেছে। আমি জান্নাতে তার স্থান দেখতে পাচ্ছি। এখন ঝান্ডা ধরেছে জাফর। পতাকা নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে সেও শহিদ হয়ে গেছে। আমি জান্নাতে তার স্থান দেখতে পাচ্ছি। এখন পতাকা নিয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। সেও পতাকা ধরে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেছে। আমি জান্নাতে তার স্থান দেখতে পাচ্ছি। তবে তার অবস্থান তার অপর দুই সাথির চেয়ে একটু নিচে। কারণ সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিল।

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে অনাকাঙ্ক্ষিত একটু দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি সাথে সাথেই নিজ আত্মাকে তখন ভর্ৎসনা করেছিলেন এই কথা বলে—

হে নফস, তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, তুমি ঘোড়া থেকে নেমে আক্রমণ করো।

কী হলো তোমার, তুমি জান্নাতকে অপছন্দ করছ?

হে আত্মা! তুমি যদি শহিদ হতে না পারো, তবুও তোমার মৃত্যু তো হবে নিশ্চয়!

যে শাহাদাতের স্বপ্ন তুমি এতদিন দেখেছিলে, আজ তুমি তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে;

তাদের দুজনের পথ যদি ধরো পেয়ে যাবে হিদায়াত।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইখলাসের সাথেই যুদ্ধ করেছিলেন। তবুও যেহেতু সামান্য দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল—এ কারণেই তার স্থান তার অপর দুই সাথির স্থানের চেয়ে নিচে হয়েছে।

অতএব, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে কোনো দ্বিধা-সংশয়ের স্থান নেই। বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং কালক্ষেপণ না করেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে; স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কোনোরূপ দ্বিধা-সংশয় হয়ে গেল কি না—এই ভয়ে সাহাবিগণ ভীত থাকতেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৫৭; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২৩; তবে এই ঘটনার কোনো সনদ পাওয়া যায় না।

নবিজির প্রিয় সাহাবি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবিজির গোপন তথ্যের সংরক্ষক। কারা কারা সাহাবির বেশ ধরে মুনাফেকি করত, রাসুলুল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত, তাদের সকলের তালিকা জানতেন হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, ইসলামের বীরযোদ্ধা, ন্যায়পরায়ণতার মূর্তপ্রতীক উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি মাঝে মাঝে হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'হুযায়ফা! তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি ঐ তালিকায় আমার নাম পেয়েছ?'[১] তিনি এটা কৌতুক করে জিজ্ঞেস করেননি। বাস্তবেই তিনি আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন, খাঁটি হৃদয়েই তিনি জানতে চেয়েছেন। আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রতাপের সামনে, আখিরাতের ভয়ে সবসময়ই তিনি নিজের নফসের হিসাব-নিকাশ করতেন। তিনি ভাবতেন, জানি না হয়তো আমি অবহেলাকারী, হয়তো আমি মুনাফিক। যদি সুদূর বাগদাদে একটি খচ্চরও পা পিছলে পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহ আমার হিসাব নেবেন।

একবার আজারবাইজানের শাসকের পক্ষ থেকে একজন দূত এলো উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। তার আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। রাত্রি বেলায় উমারের দরজার কড়া নাড়া তার কাছে অনুচিত মনে হলে সে মসজিদে চলে যায়। মসজিদে গিয়ে দেখতে পায় এক ব্যক্তি সালাত পড়ছে এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দুআ করছে, 'হে আল্লাহ! আপনি কি আমার তাওবা কবুল করেছেন? যদি কবুল করেন, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি। নাকি আপনি আমার তাওবা ফিরিয়ে দিয়েছেন? তা-ই যদি হয়, তবে আমি আপনার সামনে কেঁদেই যাব।'

সালাত শেষ হওয়ার পর দূত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?' তিনি বললেন, 'আমি উমার।'

'আপনি রাত্রে ঘুমান না?'

'দেখো ভাই, যদি আমি ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিই, তবে তো আমি আমার রবের সামনে নিজেকে ক্ষয় করে ফেললাম। আর যদি দিনে ঘুমিয়ে যাই, তবে তো আমার প্রজাদের হক নষ্ট করে ফেললাম।'

---

[১] *আল-মারিফাতু ওয়াত তারিখ*, ফাসাবি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৭৬৯

অতঃপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দূতকে সাথে করে নিয়ে বাসায় গেলেন। স্ত্রী উম্মু কুলসুমকে জিজ্ঞেস করলেন, মেহমানকে দেওয়ার মতো কী খাবার আছে? স্ত্রী উত্তর দেয়, রুটি আর লবণ ছাড়া কিছুই নেই।

সে জমানায় নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরাও মাংস-রুটি খেত। অথচ আমিরুল মুমিনিনের ঘরে শুধু রুটি আর লবণ ছাড়া কিছুই নেই। তাই তিনি মেহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনো গরিব মুসলিমের ঘরে খেতে চাও? নাকি আমার এখানে খেতে চাও?

মেহমান বলল, না, আল্লাহর কসম! আপনি খলিফা। আমি বরং আপনার এখানেই মেহমান হতে চাই।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছিলে যেন?

'আজারবাইজানের শাসকের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এই উপহার নিয়ে এসেছি। এ কথা বলে সে একটি মূল্যবান পাত্র উমারের দিকে বাড়িয়ে দিলো। তাতে ছিল সমাজের অভিজাত শ্রেণির জন্য বানানো উন্নত মানের মিষ্টিজাতীয় খাবার।'

'তোমাদের দেশের সাধারণ মুসলিমরাও কি এমন খাবার খায়?'

'জি না। এটা কেবল সমাজের ধনী আর অভিজাত নাগরিকদের জন্য বিশেষভাবে বানানো।'

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, যে খাবার গরিব সাধারণ মুসলিম নাগরিকরা খেতে পারে না, উমারের পেটের জন্য সেই খাবার হারাম। এই খাবার মদিনার গরিব মুসলিম নাগরিকদের মাঝে বিলিয়ে দাও। এরপর তিনি আজারবাইজানের শাসককে কঠোর ভাষায় দূত মারফত এক পত্রাদেশ পাঠালেন— 'সাধারণ মুসলিম জনগণ যে খাবার খায়, তুমিও সেই খাবারই খাবে।'[১]

একবার উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাস্তায় একটি হৃষ্টপুষ্ট উট দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার উট? লোকেরা উত্তর দিলো, আপনার ছেলে আব্দুল্লাহর। তিনি বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

---

[১] *আয-যায়লুর রাব্বানি* : ৩৭০

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত হলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কঠিন ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, এই উটটি কার? ছেলে উত্তর দিলেন, আমি আমার নিজের পয়সা দিয়েই এটা কিনেছি। মোটা-তাজা করার জন্য চারণভূমিতে পাঠিয়েছি; যেন একটু হৃষ্টপুষ্ট হলে তা বিক্রি করে জীবিকার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। এতে আমার অপরাধটা কোথায়? আমি ভুল কী করেছি?

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বেশ করেছ! কিন্তু তুমি আমিরুল মুমিনিনের ছেলে। সেই সুবাদে তোমার উট বাড়তি সুবিধা ভোগ করে মোটা-তাজা হয়েছে। চারণভূমিতে ভালো ঘাসের জায়গায় লোকেরা বলেছে, 'উটটিকে সুযোগ করে দাও, এটা আমিরুল মুমিনিনের ছেলের।' পানির ঘাটে গিয়ে বলেছে, 'এই উটের প্রতি সবাই বিশেষ খেয়াল রাখো, ওটা আমিরুল মুমিনিনের ছেলের।' এভাবেই তোমার উট হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। এক্ষুনি উটটি বিক্রি করে দাও। বিক্রিত অর্থ থেকে কেবল তোমার পুঁজিটুকু নেবে আর বাকিটা বাইতুল মালে জমা করে দেবে।[১]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার সাথি-সঙ্গীদের সাথে বসে ছিলেন। সাথিদের কেউ একজন বলল, আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহর পর আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ও মহৎ লোক আর কাউকে আমরা দেখিনি। তার দাবি খুবই চমকপ্রদ ছিল। সে হিসেবে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে 'বারাকাল্লাহ ফি হায়াতিক' বা 'জাযাকাল্লাহু খয়রান'-জাতীয় কোনো কথা বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি তার দিকে রক্তলাল চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন আস্ত খেয়ে ফেলবেন!

অবস্থা বেগতিক দেখে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'না, আল্লাহর কসম! আমরা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দেখেছি।' তিনি কিছুটা শান্ত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তিনি?' সে উত্তর দিলো, 'আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু।' তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা সবাই মিথ্যে বলেছ; এই একজন শুধু সত্য বলেছে।'

লক্ষ করুন, প্রথমজনের কথায় যারা চুপ করে ছিল, তিনি তাদেরকেও মিথ্যাবাদী বলেছেন। এরপর যোগ করেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে উটের পাল থেকে হারিয়ে যেতাম। আর আবু বকর ছিল মেশকের চেয়েও সুবাসিত।'

---

[১] *আল-কুদওয়াহ উমার ইবনুল খাত্তাব*, পৃষ্ঠা : ৬৯

একবার তিনি তার এক গভর্নরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষ যখন কোনো চোর বা ডাকাত ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসবে, তখন তুমি কীভাবে বিচার করবে?' গভর্নর বলল, 'আমি তার হাত কেটে দেবো।' উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তেমনি তোমার শাসনাধীন অঞ্চলের কোনো নাগরিক কখনো ক্ষুধার্ত বা বেকার থাকলে আমিও তোমার হাত কেটে দেবো।'[১]

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি পরিচালনার দায়ভার অর্পণ করেছেন আমাদের ওপর, যেন আমরা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারি, তাদের পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারি এবং তাদের পেশা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি। অতএব, আমরা যদি তাদের এই প্রাপ্য বুঝিয়ে দিই, তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহর শোকর আদায় করতে পারব।

জেনে রেখো! এই হাতগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে কাজের জন্য। তাই এই হাত যখন হালালের মধ্যে কোনো কাজ খুঁজে পাবে না, তখন হারামের মধ্যেই কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেবে। সুতরাং এই হাতগুলো হারামে জড়ানোর আগেই হালাল পথে কাজে লাগিয়ে দাও।'[২]

এমন মহান ছিলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। তা সত্ত্বেও তিনি ভয় পেতেন, তিনি মুনাফিকদের কাতারে শামিল হয়ে গিয়েছেন কি না।

সকল চাওয়া রবের কাছে

মুসা আলাইহিস সালাম একদা আল্লাহর নিকট দুআ করলেন, 'হে রব, মাঝে মাঝে আমার এমন কিছু প্রয়োজন দেখা দেয়, যা আপনার কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করি।' আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে জবাব দিলেন, 'হে মুসা! আমাকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে কিছু চাইবে না। তোমার যত প্রয়োজন সবকিছু আমার কাছেই প্রার্থনা করবে। খাওয়ার লবণ বা বকরির ঘাসই হোক না কেন, সকল প্রয়োজনে আমার দুয়ারেই হাত পাতবে।'[৩]

---

[১] *আলফু কিসসাহ*, পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[২] *আলফু কিসসাহ*, পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[৩] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম* : ২২৫; এটি একটি ইসরাইলি বর্ণনা।

আল্লাহ তাআলা বান্দার অনুনয়-বিনয়ের সাথে দুআ করাকে খুব পছন্দ করেন। তাই শেষরাত্রে উঠে পড়ুন। রাতের শান্ত, নিস্তব্ধ শেষ প্রহরে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। দু-হাত তুলে অনুনয়-বিনয় করে, হৃদয়-আত্মা আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে দুআ করুন। কারণ আল্লাহ এই ধরনের দুআ পছন্দ করেন।

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাতে এক লোক তার কাছে এসেছিল কোনো প্রয়োজনের কথা জানাতে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বাতিটা উঁচু করে ধরো। সে বাতিটা উঁচু করে ধরলো। তিনি বললেন, এবার বলো তুমি কী চাও?

তিনি সরাসরি প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। তা না করে বাতি ওপরে তুলতে বলেছেন। এর পিছনে কী রহস্য? কারণ আলোর সামনে লোকটির চেহারা চেনা গেলে সে লজ্জা পাবে এবং তার প্রয়োজন জানাতে সংকোচবোধ করবে। এমনই ছিল আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বুদ্ধিমত্তার চিত্র।

পূর্ববর্তী জনৈক আলিম ছিলেন। তিনি ভিক্ষুককে কখনো হাতে করে কিছু দিতেন না। টেবিলের ওপর রেখে দিতেন। সেখান থেকে ভিক্ষুক তুলে নিয়ে যেত। তিনি জানতেন, দাতার হাত ওপরের হাত, গ্রহীতার হাত নিচে। অতএব, একজন মুমিনের হাত যেন নিচু না হয়, সেজন্য তিনি হাতে করে কিছু উঠিয়ে দিতেন না।

প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর মহান সিফাত আল-কারিম। এই সিফাত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকেও আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ করেছেন। আর আল্লাহর মহানুভবতা ও মহত্ত্বের সিফাত হলো—

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখো। কেউ তোমার সাথে অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করে দাও। কেউ তোমাকে বঞ্চিত করলেও তুমি তার পূর্ণ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে।'

তোমার নীরবতা যেন হয় চিন্তার মগ্নতা; তোমার কথা এবং উচ্চারণ যেন হয় আল্লাহর যিকির।'[১]

---

[১] *আলফু কিসসাহ*, পৃষ্ঠা : ৪৮২

আর-রাযযাক : اَلرَّزَّاقُ

মহান রিযিকদাতা

গহীন জঙ্গালের কোনো এক গাছের চূড়ায় কাকের বাসা। সেখানে রয়েছে দুর্বল অসহায় ছোট্টপ্রাণ এক ছানা। মাত্রই ডিম ফুটে বেরিয়েছে। ক্ষুধায় খুব কষ্ট হয় ওর। নীড়ের খড়কুটোর ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে আলো-ঝলমল পৃথিবীর দিকে। ওর দিকে তাকানোর কেউ নেই, নিজের মা পর্যন্ত চেনে না ওকে। কিন্তু সপ্ত আকাশ ভেদ করে, পরম মমতা দিয়ে কেউ দেখছেন ছোট্ট সেই মিষ্টি ছানাটিকে। পরম স্নেহে ওর কাছে খাবার পৌঁছে দেন তিনি। তিনি আর-রাযযাক; মহান রিযিকদাতা।

☆☆☆

তিনি মহান রিযিকদাতা; রিযিক দান করেন সমগ্র সৃষ্টিকে। সৃষ্টিকুলের যত প্রয়োজন, যত চাহিদা—সব তিনিই পূরণ করেন, তা পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন! সীমাহীন দানে কুণ্ঠাবোধ করেন না কখনো। তাই তো তিনি শুধু রিযিকদাতা নন; বরং মহান রিযিকদাতা, যার বদান্যতা বান্দার কল্পনাকেও হার মানায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাবার নিজেরা সঞ্চয় করতে পারে না। আল্লাহই রিযিক দান করেন তাদের ও তোমাদের। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১]

আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম দুআ করতেন—

হে আল্লাহ! আপনি তো এমন সত্তা, যিনি কাকের বাসায় ছোট্ট কাকের ছানাটিকেও রিযিক দান করেন!'[২]

রিযিক লাভের উপায়

আপনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীদের একজন হয়ে থাকেন তো আপনার জন্যে সুসংবাদ! আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়ের জন্যে রিযিক প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর-রাযযাক বলেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

(হে মুহাম্মাদ!) আপনার পরিবারবর্গকে সালাত আদায়ের আদেশ দিন এবং তাতে অটল-অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না; আমিই আপনাকে রিযিক দান করি। আর সুসংবাদ কেবল মুত্তাকিদের জন্য।[৩]

কাজেই রিযিক বৃদ্ধি করতে চাইলে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে বিনয়, একাগ্রতা ও খুশু-খুযুর সাথে। খুশু-খুযুবিহীন সালাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মনে রাখবেন, এটি কিন্তু সালাতের আদব নয়; বরং সালাতের ফরয[৪]। আল্লাহ বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

[১] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৬০

[২] *আল-মাজালিস*, দাইনুরি : ১৩৫৩; *বুগইয়াতুত তলিব*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৩৪২৯

[৩] সুরা ত-হা, আয়াত : ১৩২

[৪] সালাত আদায় হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর নিকট তা কবুল হওয়া এক নয়। খুশু-খুযুবিহীন সালাত আদায় হয়ে গেলেও আল্লাহর নিকট তা কবুল হয় না—এই হিসেবে খুশু-খুযুকে সালাতের ফরয তথা অত্যাবশ্যক বলা হয়েছে।

মুমিনগণ সফল, যারা খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করে।[১]

আল্লাহই আপনার রিযিকদাতা, তাই সকল কাজে ফিরে আসুন তাঁরই দিকে। তাঁর কাছ থেকেই চেয়ে নিন সবকিছু। বান্দার আকুল চাওয়া আল্লাহ ভালোবাসেন। ঘরের হারানো চাবিটা, জুতার ছিঁড়ে যাওয়া ফিতাটা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সামান্য বস্তুগুলোও চেয়ে নিন তাঁর কাছ থেকে।

মুসা আলাইহিস সালাম এক্ষেত্রে আমাদের বড় আদর্শ। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন—

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ...﴿١٤٣﴾

মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দিন। আমি আপনাকে দেখব।’[২]

আল্লাহকে দেখার বাসনা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া। আবার যখন তিনি ক্ষুধার কষ্টে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন নিজের অসহায়ত্বের সবটুকু প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে চেয়েছিলেন খাবার ও আশ্রয়। আল্লাহ বলেন—

ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

অতঃপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন, আমি তো কেবল তারই মুখাপেক্ষী।’[৩]

তাই ছোট-বড় সবকিছুর জন্য আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করুন। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য আয়াত নাযিল করে রিযিকের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, জানিয়েছেন

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৩

[৩] সুরা ক্বাসাস, আয়াত : ২৪

রিযিকের দায়িত্ব একান্তই তাঁর। তবু মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে; পেরেশান হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদেরকে চিন্তিত হতে বলেছেন আখিরাতের ব্যাপারে; জান্নাত অর্জনের ব্যাপারে। অথচ তারা কেবল দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায় আর জান্নাতের কথা বেমালুম ভুলে যায়।

এজন্য আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'তুমি রিযিক অন্বেষণে আদিস্ট নও; কিন্তু জান্নাত অন্বেষণে আদিস্ট।'

অর্থাৎ, রিযিকের সন্ধান না করায় তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না; কিন্তু জান্নাতের অনুসন্ধান না করলে তোমাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

কী বিস্ময়কর! মানুষকে যে জিনিসের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, মানুষ তা নিয়ে কতই না ব্যস্ত! অথচ রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর রিযিক দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন এবং পরে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোনো কিছু করতে পারে? তারা যাদেরকে শরিক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান।[১]

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদের রিযিক দিই; তোমাদেরও রিযিক দিই। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[২]

وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

[১] সুরা রূম, আয়াত : ৪০

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩১

আকাশেই রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের কথাবার্তার মতোই এসব সত্য।[১]

কত হৃদয়গ্রাহী ও দৃঢ় ভাষায় আল্লাহ আমাদের রিযিকের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। তারপরও আমরা দুনিয়ার সামান্য কিছু প্রাপ্তির জন্য আখিরাতকে বেচে দিই। অথচ আখিরাতের হিসাব বড়ই কঠিন—

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

মানুষ যতটুকু কর্ম করবে তার চেয়ে বেশি কিছুই পাবে না।[২]

কিন্তু বাস্তবে আখিরাতের চিন্তা না করে আমরা উল্টো পথে রিযিকের জন্যে ছুটছি।

অকারণ দুশ্চিন্তা অর্থহীন

দুই ভাইয়ের গল্প বলি। বড় ভাইটি হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর সময় রেখে যায় পাঁচ সন্তান। তার তেমন কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। বড় ভাই মারা যাওয়ায় তার সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব ছোট ভাইয়ের ওপর বর্তায়। সে দুশ্চিন্তায় কাঁদতে শুরু করে। এক শাইখের সাথে তার পরিচয় ছিল। শাইখ তাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার! কাঁদছো কেন?' উত্তরে সে বলল, 'আমার ভাই মারা গেছে। তার পাঁচটা সন্তানের দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। অথচ ওদের খরচ বহনের কোনো ব্যবস্থা রেখে যায়নি সে।'

—সে কি কিছুই রেখে যায়নি?

—হ্যাঁ, সামান্য কিছু সম্পদ রেখে গেছে। ওগুলো দিয়ে বছর দুয়েকের মতো তাদের খরচ চলবে।

—বেশ তো! যখন এই বছর দুয়েকের খরচা শেষ হবে তখন আবার কান্না শুরু কোরো। এখন নাহয় নিশ্চিন্তে থাকো।

---

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২-২৩

[২] সূরা নাজম, আয়াত : ৩৯

পরে দেখা গেল, এক বছর শেষ হওয়ার তিন মাস আগেই লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

আমার পরিচিত এক লোক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে একবার তার বাড়িটি ভেঙে ফেলার ফরমান আসে। এর পরিবর্তে অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকে উপযুক্ত আরেকটি বাড়ি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপরও বাড়িভাঙার খবর শুনেই সে ভেঙে পড়ে। দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা আর দুঃখে তার মন খানখান হয়ে যায়। পরবর্তীতে জানা গেল, সেই বাড়িটি ভাঙার পূর্বেই লোকটা মারা গেছে। তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করে কী লাভ হলো? অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কোনো মানেই হয় না।

রিযিক যেভাবে আসে

আপনি কি দৈনিক খানাপিনা করাকেই একমাত্র রিযিক ভেবে বসে আছেন? নিঃসন্দেহে এটা রিযিক। কিন্তু রিযিক তো কেবল এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রিযিক দু-প্রকার। দেহের রিযিক ও আত্মার খোরাক। তিনি স্বীয় করুণায় আপনার মুখে খাবার তুলে দিয়ে আপনার দেহকে সতেজ রাখেন। আবার তিনিই প্রিয় বান্দাদের অন্তরে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের বোধ ঢেলে দিয়ে খোরাক জোগান আত্মার।

ধনীকে দেন সম্পদের প্রাচুর্য, আর গরিবকে দেন রিযিকদাতার সামনে মিনতি করার সুযোগ। বস্তুগত সম্পদ না পেলেও আল্লাহ তাকে দান করেন আত্মিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি, আল্লাহর ফয়সালায় সবর ও সন্তুষ্টির পরম প্রাপ্তি। তুলনা করলে দেখা যাবে তারা দুজন প্রায় সমান। একজনের রয়েছে বস্তুগত সমৃদ্ধি; কিন্তু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ঝক্কি, মানসিক অশান্তি। আরেক জনের বস্তুগত সংকট; কিন্তু হৃদয় ও আত্মার জগতে সে বাদশাহ।

অফুরন্ত ভান্ডার

বান্দা যখন আল্লাহর কাছে রিযিক প্রত্যাশা করে তখন আল্লাহ তাকে রিযিক প্রদান করেন। হয়তো রাস্তা দিয়ে চলতে ফিরতে বেকার কেউ চাকরির সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। আপনার আশপাশে তাকালে এমন হাজারটা দৃষ্টান্ত পাবেন। বিখ্যাত বুযুর্গ হাতিম আসাম রাহিমাহুল্লাহর কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয় কোথা থেকে?' হাতিম আসাম রাহিমাহুল্লাহ উত্তর দেন, 'আল্লাহর খাদ্যভান্ডার থেকে।' লোকটি একটু চটে গিয়ে বলে, 'আল্লাহ কি

আসমান থেকে আপনার ওপর রুটি ফেলে দেন? তা না হলে এই কথার অর্থ কী?'

হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'যদি জমিন না থাকত তাহলে আল্লাহ অবশ্যই বান্দার কোলে রুটি ফেলতেন। কিন্তু যেহেতু জমিন সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি এই জমিন থেকেই আমার রিযিকের ব্যবস্থা করেন।'

আপনি যখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবেন আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা, মহান শক্তিধর, তখন অবশ্যই সব কাজে আপনি আল্লাহকে স্মরণ করবেন আলাদা আলাদাভাবে। রোগ-ব্যাধি ভালো হয়ে গেলে আপনি নিশ্চয় বলবেন, আল্লাহই আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আপনি তখন এর-ওর পেছনে দৌড়াবেন না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে প্রয়োজন ব্যক্ত করবেন না।

জনৈক ইবাদতগুজার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয় কোথা থেকে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এমন এক মালিকের ভান্ডার থেকে খাবার পাই, যার ভান্ডারে কখনো কোনো চোর-ডাকাত ঢুকতে পারে না, পোকামাকড়ও খেয়ে নষ্ট করতে পারে না।'

আল্লাহর ধনভান্ডার সর্বদা উন্মুক্ত; কারো জন্য তা রুদ্ধ নয়। তার ভান্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ; কখনো তাতে ঘাটতি হয় না। ছোট-বড় সকল বস্তু রয়েছে সেখানে। আল্লাহ বলেন—

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

আমার নিকটই রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।[১]

টমাস রবার্ট ম্যালথাসের তত্ত্ব

পৃথিবীর ইতিহাসে জনসংখ্যাবৃদ্ধির তত্ত্ব ইসলামের মানদণ্ডে বাতিল। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টমাস রবার্ট ম্যালথাস। তার ধারণা ছিল,

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ২১

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদনের ভারসাম্য বজায় থাকবে না; যা নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ ডেকে আনবে এবং খাদ্য না পেয়ে বাড়তি জনসংখ্যা বিলীন হয়ে যাবে।

আসলে এমন কথা কেবল সেসব লোকই বলতে পারে, যারা আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করতে অক্ষম।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সংকোচন, সংকট বা দুর্ভিক্ষ এলে তা মানুষের পরীক্ষা, শাস্তি কিংবা সংশোধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। মানুষ যখন কোনো কিছুতে সংকটের মুখোমুখি হয়, তখন সে অক্ষমতার কারণেই সংকটে পতিত হয়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সংকট এলে তা অক্ষমতার কারণে হতে পারে না। তিনি সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়ার জন্য কিংবা পরীক্ষা নিতে এমনটি করে থাকেন।

জনৈক নেককার ব্যক্তির স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার স্বামী আপনাকে কী পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয়?' তখন সে উত্তর দিলো, 'তিনি আমাকে কিছুই দেন না; কেবল ওজন করেন।' অর্থাৎ, দাতা তো একমাত্র আল্লাহ, স্বামী কেবল পরিমাপ করে পৌঁছে দেন।

একবার আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে গেলে দুনিয়ার কোনো কিছু হারানোর ব্যথা আপনাকে পর্যুদস্ত করতে পারবে না। কখনো যদি কোনো কিছু হাতছাড়া হওয়ায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন, তাহলে বুঝে নেবেন আপনি আসলে আল্লাহকেই এখনো চিনতে পারেননি। যে আল্লাহর পরিচয় পেয়েছে, যে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছে, সে ব্যথিত হলেও তা তাকে আফসোসের দিকে ঠেলে দেয় না। কত মানুষ জমি বিক্রি করে দেওয়ার কিছুদিন পর জমির দাম হয়ে যায় দ্বিগুণ। তখন সে হা-হুতাশ শুরু করে দেয়, অস্থির হয়ে ওঠে। হায়! জমিটুকু যদি আজ থাকত, তাহলে আমার কপাল খুলে যেত!

বর্তমানের যা কিছু জটিল রোগ, তার অধিকাংশই আসে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, উৎকণ্ঠা এবং মনস্তাত্বিক কারণে।

প্রার্থনা কেবল তাঁরই কাছে

একবার জনৈক উমাইয়া খলিফা কিছু উপহার দেওয়ার জন্যে একজন বড় আলিমকে তলব করলেন। খলিফা মসজিদে বসে ছিলেন। আলিম তার সাথে সাক্ষাৎ করতে

এলেন। খলিফা বললেন, 'আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করুন।' আলিম উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আমি চাই না। তাঁরই ঘরে বসে তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইতে আমি লজ্জাবোধ করি।'

তারপর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে খলিফা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আপনার প্রয়োজন পেশ করুন।' আলিম আরো শক্ত জবাব দিয়ে বললেন, 'যিনি মালিক তাঁর কাছেই তো চাইলাম না; তাহলে যে মালিক নয় তার কাছে কী করে চাইব?'

খলিফা খুবই পীড়াপীড়ি করলেন। উপায় না দেখে আলিম বললেন, 'আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই।' খলিফা বললেন, 'সে ক্ষমতা আমার নেই। আলিম উত্তর দিলেন, তাহলে আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজনও নেই।'[১]

এটা একজন মুমিনের আত্মমর্যাদাবোধের দাবি। অভাবী নিজ প্রয়োজন কারো কাছে ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকলে সেটাই উত্তম।

এক মনীষী বলেছেন, 'যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তেমনি আল্লাহ ছাড়া কোনো রিযিকদাতাও নেই। তিনি যখন দান করেন, অকাতরে দান করেন। এত বেশি দেন যে, বান্দা অবাক না হয়ে পারে না।'

আপনি দেখবেন কত মেধাবী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক আছে, তাদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা খুবই সামান্য। আবার কত বোকা, অবিবেচক লোককেও দেখবেন, তাদের প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, মেধা-বুদ্ধি, ব্যবস্থাপনা ও দৌড়ঝাঁপের সাথে রিযিকের মৌলিক কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য আল্লাহর পথে অটল-অবিচল থাকা, তাঁর আনুগত্য করা—এগুলো আল্লাহর রহমত বর্ষণ করে। কিন্তু রিযিকের মূল হিসাব আল্লাহর ব্যবস্থাপনার সাথে। তাই দেখা যায়, অনেক নেককার মুমিন কষ্টে জীবনযাপন করলেও কাফির মুশরিকদের প্রাচুর্যের অভাব হয় না। এর দ্বারা তিনি মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তাদের পরীক্ষা নেন।

মহামহিম আল্লাহ বলেন—

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

---

[১] *মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৮৪

তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে আমি তাদেরকে অবিরল ধারায় পানি বর্ষণের দ্বারা সমৃদ্ধ করতাম।[১]

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

যদি সেইসব জনপদের লোকজন ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।[২]

পাপের শাস্তিস্বরূপ কখনো কখনো মানুষের রিযিক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধরা যাক, আপনার দুটি ছেলে। একজন খুবই ভদ্র। টাকা-পয়সা কখনো অপচয় করে না। বড়দের সম্মান করে চলে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। ঠিকমতো পড়াশোনা করে। আরেক ছেলে ভীষণ অভদ্র। পড়াশোনা তো করেই না, বরং নানারকম অনৈতিক কাজকর্ম এবং নিষিদ্ধ স্থানে যাওয়া-আসা করা তার বহুদিনের অভ্যাস। এখন দুই ছেলেকে টাকা-পয়সা কিংবা হাতখরচ দেওয়ার সময় আপনি কি সমান-সমান দেবেন? কখনোই না। অভদ্র ছেলেটিকে আপনি শুধু গাড়িভাড়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন, যেটা না দিলেই নয়। কারণ তার হাতে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা থাকা মানেই তা কোনো অনৈতিক ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে ব্যয় হওয়া। কিন্তু যে ছেলেটি ভদ্র তাকে আপনি প্রয়োজনের চেয়েও বেশি টাকা দিয়ে রাখবেন। হয়তো তাকে এক্ষেত্রে স্বাধীনতাও দিয়ে রাখবেন, 'বাবা! তোমার যখন যা প্রয়োজন পড়ে, এটা দিয়ে কিনে নিয়ো।' আপনি জানেন, সে আপনার পক্ষ থেকে স্বাধীনতা, টাকা-পয়সা পাওয়ার পরও কোনো অনৈতিক কাজে জড়াবে না। ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাআলাও কখনো কখনো পাপিষ্ঠ ও অন্যায় ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ব্যক্তির রিযিক সংকুচিত করে দেন, যেন সে তার অন্যায়-অপরাধে একেবারে বেপরোয়া হয়ে না পড়ে। কারণ আল্লাহ যদি তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের রশি টেনে না ধরেন,

[১] সুরা জিন, আয়াত : ১৬

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ৯৬

তাহলে সে অবাধ্যতা ও উগ্রতায় সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আল্লাহ খুব চমৎকারভাবে সত্য প্রকাশ করে বলেছেন—

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রাচুর্য দিলে, নিশ্চয় তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামতোই নাযিল করে থাকেন। তিনি বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।[১]

আপনার কোনো এক দ্বীনি ভাই, যার সাথে আপনার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে। ভালোবাসার আতিশয্যে আপনি তাকে বলে ফেললেন, 'কোনো প্রয়োজনে শুধু আমাকে জানাবে; যা দরকার হয় আমার কাছ থেকেই নেবে; অন্য কাউকে বলবে না।' আপনার প্রিয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অন্য কারো সামনে অবনত হোক তা আপনি পছন্দ করেন না। তাহলে ভেবে দেখুন, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে সীমাহীন ভালোবাসেন, সেখানে তিনি কীভাবে তাঁর বান্দার অন্য কারো কাছে নত হওয়া পছন্দ করবেন? তিনি আমাদের অনেক বেশি ভালোবাসেন বলেই অন্য কারো কাছে প্রয়োজন ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

কিছুদিন আগে সদ্য-পাশ-করা একজন ডাক্তার আমাকে একটি কাহিনি শোনালো। সে তখন ডাক্তারি পড়াশোনা শেষ করে একটি চেম্বার খুলেছে মাত্র। কিন্তু পরিচিতি বেশি না থাকায় রোগী তেমন একটা আসত না। একবার তার মায়ের চিকিৎসার জন্য মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন দেখা দিলো। মা তখন দামেশকে চিকিৎসাধীন। অথচ তার চেম্বার অন্য একটি শহরে। মায়ের চিকিৎসার জন্য যত টাকার প্রয়োজন সেই পরিমাণটা উল্লেখ করে সে আল্লাহর কাছে আকুলভাবে দুআ করল। ঠিক তার পরদিনই তার চেম্বারে রোগীদের ভিড় লেগে গেল। আর সেদিনই সম্পূর্ণ টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল!

আপনার কাছে কারো পাওনা রয়েছে, কিন্তু আপনার পরিশোধের মতো সামর্থ্য নেই; আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! আমার কাছে নেই; তুমিই পরিশোধ করে দাও।' এভাবে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার অভ্যাস করুন।

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ২৭

আপনার স্ত্রী কঠোর স্বভাবের। আল্লাহর কাছে দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! তাকে নরম ও কোমল স্বভাবের বানিয়ে দাও।' আপনার সহকর্মী বা ব্যাবসায়িক পার্টনার কুটিল ও বদমেজাজি। আল্লাহর কাছে দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! তার মনকে সোজা করে দাও; কোমল বানিয়ে দাও।' আপনার সন্তান একরোখা, রগচটা; কারো কথায়ই কর্ণপাত করে না। আল্লাহর কাছে দুআ করুন, 'হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে সুমতি দান করো। তার চরিত্র মার্জিত করে দাও।'

আপনি যখন আপনার প্রয়োজন সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইবেন, অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, তখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন। আর যখন অন্য কারো কাছে চাইবেন, তখন কারো মাধ্যমে আল্লাহ আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আপনি যার কাছে চাইবেন হয়তো আল্লাহ তাআলা তার মনকে আপনার জন্য নরম করে দেবেন। সে দয়াপরবশ হয়ে আপনার চাওয়া পূরণ করবে।

হাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষের বিপদাপদে পাশে দাঁড়াতেন। সাধ্যমতো দান-সাদাকা ও উপকার করার চেষ্টা করতেন। তার পাশের বাড়িতে থাকতেন এক বিধবা নারী। সাথে কয়েকটা এতিম সন্তান। একরাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। মহিলাটি তখন আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! হে পরম করুণাময়! আপনি আমাদের অভাব-অনটন দূর করে দিন। আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা দান করুন।' পাশের বাড়ি থেকে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ শুনতে পেলেন বিধবার এই উচ্চৈঃস্বরের দুআ। দুঃখে ভরে উঠল তার মন। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর তিনি দশটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সেই প্রতিবেশীর ঘরে কড়া নাড়লেন। স্বর্ণমুদ্রার থলেটি মহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রেখে দিন। আপনার প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে।'

থলেটি সে গ্রহণ করলেও তার পাশে বসে থাকা ছোট কন্যা রীতিমতো চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল। আল্লাহ ও বান্দার মাঝের গোপন বিষয় বাইরের মানুষ জেনে যাওয়াতে এই সাহায্য এসেছে—এটা তার মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল।[১] বান্দার করুণার পাত্র হওয়ার চেয়ে আল্লাহর কাছে করুণা ভিক্ষা করাই যে মুমিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয়!

---

[১] *আলফু কিসসাহ* : ৮৬৮

যারা প্রকৃত মুমিন তারা তাদের সকল ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর কাছেই পেশ করে। দেখুন আল্লাহর নবি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আকুতি—

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

আমি তো আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। আর আমি আল্লাহর নিকট থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।[১]

আল্লাহর কাছে চাওয়ার পর যদি তাৎক্ষণিক আপনার চাওয়া পূরণ না হয়, এতে হতাশ হবেন না। অনেক সময় আল্লাহ না দিয়ে পরীক্ষা করেন। বান্দার অন্তরে আল্লাহর জন্য কতটুকু জায়গা রয়েছে তা তিনি যাচাই করে দেখেন। দুনিয়াবি কত কাজে মানুষ একটু সুখের জন্য কত অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে। তাহলে আখিরাতের বিশাল প্রাপ্তির সামনে ক্ষণিকের না পাওয়া কি সহনীয় হতে পারে না?

একবার একটি ব্যাংকের সামনে জনতার ভিড় দেখলাম; পাঁচশোর মতো লোক দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড গরম, সময় দুপুর আড়াইটা। কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, কী হয়েছে এখানে?'

উত্তর এলো, 'সন্ধ্যা ছটায় গাড়ি রিজার্ভেশনের রেজিস্ট্রি হবে।'

সন্ধ্যা ছটায় রেজিস্ট্রি। আর এই তীব্র গরমের মধ্যে তারা দাঁড়িয়ে আছে দুপুর আড়াইটা থেকে! দুনিয়ার জন্য মানুষ কত কষ্টই না করে!

আরেক ভদ্রলোক আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। আমি যতদূর জানি, তিনি যথেষ্ট গণ্যমান্য ও গুরুত্বসম্পন্ন এক ব্যক্তি। সবসময় হারাম বস্তু থেকে নিজের দৃষ্টি হিফাজত করে চলেন। একবার কোনো একটা সেমিনারে যোগ দেওয়ার জন্য ইউরোপ গমন করেন তিনি। সাইপ্রাসের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লার্নাকায় সুইডিশ বিমান থেকে হঠাৎ অনেকগুলো মেয়েকে একসাথে নামতে দেখলেন। তাদের পরনে ছোট ইউনিফর্ম। তিনি তার দৃষ্টির হিফাজত করতে পারলেন না সেদিন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬

গেলেন গন্তব্যে। ভাড়া পরিশোধের সময় ভিনদেশি মুদ্রা দিতে গেলে ড্রাইভার তাকে থানায় নিয়ে গেল। থানায় ঢুকে ড্রাইভারটি পুলিশ অফিসারের সাথে কী যেন বলল। অমনি দুজন পুলিশ কর্মকর্তা এসে ভদ্রলোকটিকে গ্রেফতার করে ফেলল। আটকে রাখল একটি ছোট্ট খাঁচার মতো কক্ষে।

এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্যে তিনি তার দৃষ্টির খিয়ানতকেই দায়ী মনে করলেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন, এই বিপদ তার পাপের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়!

একবার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, দামি পোশাক পরিহিত কেতাদুরস্ত এক লোক কী যেন ট্রাফিক জটিলতায় পুলিশের সাথে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করছে। একটু পরে আরেকজন পুলিশ অফিসার এলো। এসেই লোকটার দুই গালে সজোরে দুটি চড় বসিয়ে দিলো। আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম।

আল্লাহ কতভাবেই না মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন! কাউকে এমনিতেই মাফ করে দেন। আবার কাউকে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।

অনেক মানুষ আছে, তারা আল্লাহর কাছে কেবল মূল্যবান বস্তুই প্রার্থনা করে—'হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাত দান করুন।' 'হে আল্লাহ! আমার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্বে আপনি আমাকে মৃত্যু দেবেন না।' 'হে আল্লাহ! আমাকে কুরআন বোঝার তাওফিক দিন' ইত্যাদি। এর বিপরীতে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহর কাছে খুব সামান্য ও তুচ্ছ বস্তুও প্রার্থনা করে—'হে আল্লাহ! এ মাসে ভাড়াটিয়া ঘর ছেড়ে দেবে। আপনি আমাকে নতুন ভাড়াটিয়ার ব্যবস্থা করে দিন।' প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রয়োজন ও অন্তরের ঝোঁক অনুযায়ী একেক জিনিস আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

সাবিত আল-বুনানি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে তার নিজ নিজ প্রয়োজন যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। লবণ ফুরিয়ে গেলে বা জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও যেন সে আল্লাহর কাছ থেকে তা চেয়ে নেয়।'[১]

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ৩৬০৪

যিনি আত্মার রিযিকদাতা

আল্লাহ তাআলা আমাদের দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তা আমরা সবাই উপলব্ধি করি। খাদ্য, পানি এবং অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনিভাবে প্রতিনিয়তই আমাদের রুহ ও আত্মার খোরাক দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখছেন। আমাদের কোনো অসংগতির কারণে তিনি যেমন কখনো কখনো রিযিক বন্ধ করে দেন, তেমনিভাবে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো আত্মার রিযিকও সংকুচিত করে দেন। যাদের অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তারা তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু যারা আত্মভোলা, উদাসীন তারা এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।

আপনি সালাত পড়ছেন কিন্তু তাতে খুশু-খুযু, বিনয় ও নিবিষ্টতা আসছে না, তাহলে বুঝে নিন, আল্লাহ আপনার রুহ ও আত্মার খোরাক সংকুচিত করে দিয়েছেন। এক ভাই এসে বললেন, হিসাব-নিকাশে যত ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হয়, সালাতে দাঁড়ালে সবকিছুর কথা মনে পড়ে। এর অর্থ হলো, হৃদয় এবং আল্লাহর মাঝে এক পর্দার আড়াল তৈরি হয়েছে। তাই তার মন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট না হয়ে দুনিয়াবি চিন্তায় মজে থাকে।

আল্লাহ কেন আপনার রিযিক সংকুচিত করছেন, তার দুটি কারণ হতে পারে—

এক. আপনি কারো হক নষ্ট করেছেন; কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেননি।

আল্লাহ বলেন, 'যখন আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন, তার রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক তো আমাকে হীন করেছেন। না, কখনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান করো না এবং অভাবীদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেলো। তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাসো।[১]

অন্যকে বঞ্চিত করায় আপনার এবং আপনার রবের মাঝে বাধা তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক পাপেরই কুফল রয়েছে। প্রত্যেক পাপই আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পথে একেকটি বাধা।

---

[১] সুরা ফজর, আয়াত : ১৬-২০

দুই. মাঝে মাঝে এমন হয় যে, আপনি আল্লাহর পথেই বহাল আছেন। আল্লাহর হুকুমের অধীনেই আপনার জীবন পরিচালনা করছেন। তবুও আল্লাহ আপনার রিযিক সংকুচিত করছেন। এর কারণ, আল্লাহ আপনার পিপাসাকে তীব্র করে তুলছেন। আপনি একটি আমল করার কারণে আল্লাহর কাছে একটি স্তরে উপনীত হচ্ছেন। কিছুদিন পর এই আমলটি আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনার স্তর যা ছিল তার চেয়ে আর উন্নত হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলা চান আপনার স্তর আরো উন্নত হোক। তখন তিনি আপনার আত্মার রিযিক তথা প্রশান্তি, দীপ্তি এবং উপলব্ধির স্বাদ সংকুচিত করে দিচ্ছেন। এতে অস্থির হয়ে নতুন উদ্যমে, পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আমলে মনোনিবেশ করছেন, আরো বেশি নিবিষ্টতার সাথে ইবাদত করতে শুরু করছেন। এতে আপনার যে মর্যাদা ছিল, আল্লাহ তাআলা তা আরো অনেক উন্নত করে দিচ্ছেন।

জীবনে বিভিন্ন কারণেই মানুষ খুশি হয়। আপনি যাচাই করে দেখুন—কার জন্য খুশি হচ্ছেন, আল্লাহর জন্য না দুনিয়ার জন্য?

খুশিতে আপনার চেহারা ঝলমল করছে, জ্বলজ্বল করে উঠেছে চোখের তারা। সহাস্য বদনে খুব উৎফুল্ল হয়ে নিজের খুশি প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। আগে চিন্তা করে দেখুন, কেন আপনি এত উৎফুল্ল। যদি এমন হয়, আল্লাহর সাথে আপনার বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, আপনি ইবাদতে খুব তৃপ্তি পেয়েছেন, জান্নাতের কোনো নিয়ামত আপনাকে পুলকিত করে তুলেছে—আর এসব কারণেই আপনি প্রচণ্ড খুশি হয়েছেন, তাহলে এটা নিশ্চয় আপনার ঈমানের নিদর্শন। যে খুশি আল্লাহর জন্য নিবেদিত তা নিশ্চয় ঈমানের আলামত।

আর যদি এমন হয়, আপনি ব্যবসায় মোটা অঙ্কের লাভ করেছেন বা নতুন কোনো উপার্জনের সন্ধান পেয়েছেন, তাই আপনি এত খুশি; তাহলে জেনে রাখুন, আপনার এই খুশি অন্য কিছুর বার্তা দিয়ে যায়। যে খুশি আল্লাহর জন্য নয়, তা কখনো সৌভাগ্যের লক্ষণ হতে পারে না।

দুনিয়া বা দুনিয়ার মানুষ যদি আপনার খুশির কারণ হয়, তাহলে আপনি দুনিয়াদার। আর আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ যদি আপনাকে খুশি করে, তাহলে আপনি ঈমানদার। ইমাম হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যখন তুমি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করো, আল্লাহর যিকির করো কিংবা নবিজির ওপর দরুদ পাঠ

করো, কিন্তু কোনো স্বাদ বা তৃপ্তি অনুভব করতে পারো না; তাহলে জেনে রেখো, তোমার অন্তর পর্দা দ্বারা আবৃত। আল্লাহ আর তোমার মাঝে রয়েছে গাঢ় আচ্ছাদন।'

মহান আল্লাহ বলেন—

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝

কখনো না। সেদিন তারা তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।[১]

উল্লিখিত অন্তরাল তো আখিরাতের পর্দা। কিন্তু দুনিয়াতেও পর্দা রয়েছে। অন্তরের পর্দা; যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরিতে বাধা প্রদান করে। আপনি যদি কখনো অন্তরে পর্দা অনুভব করেন, আপনার অন্তর আল্লাহর ব্যাপারে পাষাণ হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে যান। খুঁজে বের করুন, কেন আপনার অন্তর আল্লাহর ব্যাপারে পাষাণ হয়ে গেল।

হয়তো আপনি আল্লাহর ব্যাপারে কোনো মন্দ ধারণা পোষণ করেন, তাঁর রাসুলের ব্যাপারে কোনো অবান্তর চিন্তা নিয়ে পড়ে আছেন। হয়তো আপনার অজান্তেই কোনো অনৈতিক বিশ্বাস জেঁকে বসেছে আপনার হৃদয়সত্তায়। কারণটা আবিষ্কার করে সাথে সাথেই তা দূর করার চেষ্টা করুন।

অন্তরের পর্দা কখনো পুরু হতে পারে, আবার কখনো পাতলাও হতে পারে। আপনার হৃদয়ের পর্দা যদি হয় মোটা, তবে নিঃসন্দেহে আপনার জটিলতা অনেক বেশি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। আপনার ফজর সালাত কাযা হয়ে গেছে। তারপরও আপনার মনে কোনো অনুশোচনা জাগল না, তাহলে বুঝবেন, অবস্থা খুবই গুরুতর।

আর যদি অনুশোচনার তাপে আপনার মন পুড়ে যেতে চায়, আল্লাহর সামনে লজ্জায় আপনি সংকুচিত হয়ে যান এবং ব্যথায় আপনার হৃদয় কেঁদে ওঠে, তাহলে আপনি আপনার অন্তরের প্রহরায় থাকুন, যেন তা দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাসে পরিণত না হয়।

---

[১] সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৫

দাউদ আত-তায়ি রাহিমাহুল্লাহ একজন মুত্তাকি ছিলেন। একবার এক লোক তার সাথে সাক্ষাতে আসে। তিনি তখন বেশ প্রসন্ন। লোকটি জিজ্ঞেস করে, যখনই আপনার কাছে আসি, আপনাকে সবসময় বিমর্ষ, চিন্তিত দেখি। কিন্তু আজ আপনি বেশ প্রফুল্ল!

দাউদ আত-তায়ি উত্তর দিলেন, গত রাতে আল্লাহ আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তাই আজকের দিনটি আমি ঈদের দিনের মতো খুশিতে যাপন করছি। লোকটি বলল, তাহলে আপনার ইফতার করার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি?

দাউদ আত-তায়ি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমি এ খাবার চাই না। যে খাবার মানুষের হাতে হাতে আসে সে খাবার এবং যে খাবার হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটায়—এ দুয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান।

অর্থাৎ খাবারও দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটা বস্তুগত খাবার, যা ভক্ষণ করা যায়। আরেকটা হলো আত্মিক খাবার, যা হৃদয়ে দীপ্তির ঝলক বিচ্ছুরিত করে।

আল্লাহর স্মরণে সীমাহীন সুখ

মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে সুখ ও সাফল্য খোঁজে, তবে তা কঠিন বিপদ ডেকে আনে। আল্লাহ সত্য, তিনি সত্য সংবাদই প্রদান করেন। আল্লাহই ঘোষণা দিচ্ছেন—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।[১]

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ১২৪-১২৫

তখন আল্লাহ উত্তরে বলেন—

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ

এভাবেই আমার নিদর্শনাবলি তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। তাই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো।[১]

অতএব, সবসময় আল্লাহকে স্মরণ রাখুন। সুখ খুঁজে নিন তাঁর আনুগত্যে। সৌভাগ্য অর্জন করুন তাঁরই নৈকট্যে।

আর-রাযযাকের পরশে

তিনি আপনার জন্য যা ভালোবেসেছেন, তা-ই আপনাকে দান করেছেন। অতএব, তার বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকুন। যে বাবা-মায়ের ঔরসে তিনি আপনার অস্তিত্ব দান করেছেন, সন্তুষ্ট থাকুন তাদের নিয়ে। আপনার জন্য যেমন বাবা-মা প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনই তিনি আপনাকে দিয়েছেন।

আপনার বন্ধুর বাবা সন্তানকে খুব আদর করে, তার মনটা খুব কোমল, সে অনেক উন্নত চরিত্রের অধিকারী; আর আপনার বাবা কর্কশ, বদমেজাজি। বন্ধুর বাবা উচ্চশিক্ষিত, সম্পদশালী, বড় পদমর্যাদার অধিকারী; আর আপনার বাবা মূর্খ, হতদরিদ্র—এসব চিন্তা করে কখনো মন খারাপ করবেন না। কারণ, মহান আল্লাহ তাঁর শাশ্বত প্রজ্ঞা ও অসীম জ্ঞানের আলোকেই তাদেরকে আপনার জন্য নির্বাচন করেছেন। অতএব, তাদেরকে সৌভাগ্য মনে করুন। আল্লাহর জন্য হলেও তাদের ভালোবাসুন।

ঠিক একইভাবে আপনার দৈহিক গঠন, রূপ-সৌন্দর্য এবং শারীরিক আকৃতির ব্যাপারেও আল্লাহর পছন্দে খুশি থাকুন। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর অভিযোগ করে, সে সত্যিকার মুমিন হতে পারে না। পিতা, মাতা, দৈহিক আকার-আকৃতি, স্ত্রী-পরিজন, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছুর ক্ষেত্রেই আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। এতে আপনি যে আত্মিক প্রশান্তি পাবেন তা অন্য কোথাও কল্পনা করাও সম্ভব নয়। অমুসলিম, অবিশ্বাসী মানুষগুলো সারা

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১২৬

জীবন অস্থিরতা ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেই দিন কাটায়। স্ত্রী মনমতো না হলে, হতাশ হয়ে পড়ে। কোনোকিছুতেই তার জীবনের দুঃখ আর ঘোচে না। কিন্তু মুমিন আল্লাহর পছন্দে খুশি হয়, তাই সে সহজে হতাশ হয় না। আপনার স্ত্রী যদি আপনার মনমতো না-ও হয়, তবুও বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তাআলা তার মাঝেই আপনার কল্যাণ রেখেছেন। তাকে নিয়েই খুশি থাকুন সবসময়।

এক লোকের বদমেজাজি স্ত্রী ছিল। তার বন্ধুরা পরামর্শ দিলো, বউকে তালাক দিয়ে দাও। কিন্তু সে উত্তরে বলল, আমি তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোনো মুসলিম ভাইকে ধোঁকা দিতে পারব না। অর্থাৎ সে আল্লাহর ফয়সালায় খুশি ছিল। তার কাছে স্ত্রীর যতটুকু সমস্যা ছিল, সেটাকে সে অন্য মুসলিম ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করা ভালো মনে করেনি।

সার কথা, আপনি সদা সর্বদা আল্লাহর ফয়সালা ও বন্টনে খুশি থাকুন। আল্লাহর সান্নিধ্যেই সৌভাগ্য অর্জন করুন। আর-রাযযাক আপনাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তাতে তৃপ্ত হোন। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা আপনার হাতে যে সম্পদ দিয়েছেন, তাকে আমানত মনে করুন। তা আপনার মালিকানা নয়; আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কাছে রাখা আমানত। অতএব, তা খরচের পদ্ধতি ও খাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ীই খরচ করুন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন—

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং এ দুয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।[১]

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৭

আল-খাবির : اَلْخَبِيْرُ

সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞ, পরিজ্ঞাত

ছোট্ট শিশুর দাঁত তুলতে হবে। দন্ত-চিকিৎসক সবটুকু কৌশল ব্যয় করে আলতোভাবে দাঁত তোলার চেষ্টা করে যায়। শিশুটি যেন ব্যথা না পায় সেজন্য তার সাথে মজার মজার কথা বলতে থাকে। তবুও কি পারে বাচ্চাটিকে ভুলিয়ে রাখতে? হয়তো দাঁত উপড়ে ফেলার অসহনীয় যন্ত্রণা অথবা চেতনানাশক ইঞ্জেকশন পুশ করার নিদারুণ কষ্ট—দুটির কোনো একটি বাচ্চাটিকে কাঁদিয়েই ছাড়ে! কিন্তু আল্লাহ যখন এই শিশুটির দুধদাঁত পরিবর্তন করতে চান, কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই দাঁতের গোড়া নড়বড়ে করে দেন। মজার খেলনার মতো বাচ্চা নিজেই দাঁতটি তুলে ফেলে। কোনো ব্যথা-বেদনা ছাড়াই পড়ে যায় সেই দাঁত। যিনি অতি আদর করে এমন আলতোভাবে সোনামণির দাঁত তুলে দেন তিনিই আল-খাবির; মহাবিজ্ঞ রব।

☆☆☆

আল-খাবির এমন সত্তা যিনি সবকিছু জানেন; কোনো কিছুই তাঁর অবগতির বাইরে থাকতে পারে না। সকল বিষয়ের মূল উপাদান, স্বভাব-প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত তিনি। কোনো লুকায়িত ব্যাপার তাঁর কাছে অস্পষ্ট থাকে না। রোগ এবং রোগের চিকিৎসাও তিনি জানেন। সকল বস্তুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। চর্মচোখে আমরা যা কিছু দেখতে পাই বা না পাই, তিনি তার সবকিছুই দেখেন। ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'অভ্যন্তরীণ এবং অন্তরের মধ্যে লুকায়িত কোনো খবরও যার কাছে অস্পষ্ট থাকে না তিনি আল-খাবির।' পৃথিবী ও মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ঘটতে পারে না। ক্ষুদ্রকায় একটি পিপীলিকাও তাঁর অবগতির বাইরে চলাফেরা করতে পারে না, গর্তে আশ্রয় নিতে পারে না। বিপদাপদে কেউ অস্থির হয়ে উঠুক, পিপাসায় ছটফট করুক কিংবা শান্ত-প্রশান্ত থাকুক, তার খবরও তিনি রাখেন।

কেউ ভাবতে পারেন এগুলো তো আল-আলিম, মহাপরিজ্ঞাত সত্তার বৈশিষ্ট্য। আল-খাবিরের সাথে এসবের কী সম্পর্ক? কিন্তু বাস্তবে আলিম এবং খাবিরের মাঝে বিস্তর ফারাক।

আমি সবার সামনে একটি গ্লাস উঠিয়ে অন্য জায়গায় রাখলাম। আপনি দেখলেন, আমি গ্লাস উঠিয়ে রেখেছি। তাহলে এ ব্যাপারে আপনার অবগতি রয়েছে। আপনি বিষয়টি জেনেছেন। কিন্তু আমি কেন গ্লাসটি উঠিয়েছি, কেনই বা তা সরিয়ে অন্য কোথাও রেখেছি—সে ব্যাপারে, আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না।

কিন্তু আল-খাবির হলেন সেই সত্তা যিনি বাহ্যিক অবগতির সাথে সাথে তার অভ্যন্তরীণ রহস্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সমানভাবে অবগত।

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন—

...وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত।[1]

আপনি কৌশল করে অসৎ উদ্দেশ্যে একটি কাজ করলেন। পৃথিবীর কেউ জানল না আপনার মনের অভিপ্রায়। সকলে ভাবল আপনি বেশ ভালো একটি কাজ করেছেন। অথবা প্রকাশ্যে আপনি কাউকে অভিনন্দন জানালেন অথচ ভেতরে ভেতরে আপনি তাকে প্রচণ্ড রকম ঘৃণা করেন। কখনো কারো সামনে আপনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, অথচ আপনার অন্তর্জগৎ তার প্রতি বিদ্বেষে ভরপুর। বাইরের পৃথিবীর কেউ জানে না আপনার আসল পরিচয়। কিন্তু আপনার অন্তরের অতলান্তের ঐ সংবাদটুকুও

[১] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৩

যিনি জানেন তিনি আল-আলিম (সম্যক অবগত) হওয়ার পাশাপাশি আল-খাবির তথা মহাবিজ্ঞ।

কারো বাসায় তার স্ত্রীর বান্ধবী বেড়াতে এলো। স্ত্রীর সাথেই সে বসল। তখন স্বামী খুব বিনয়ের সাথে বলল, তোমরা এখানে এসো। এই ঘরটি বেশ উষ্ণ; এখানে দারুণ সময় কাটবে তোমাদের।' এখন খেয়াল করে দেখুন। স্বামী যে আবেদন করেছে সেটাই কি বাস্তব নাকি 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'? বাস্তবেই সে কি অতিথির সমাদর করতে চায়? না তার অন্তরে জেগে ওঠা কোনো কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়? অতিথি বুঝবে না; স্ত্রীও বুঝবে না। কিন্তু প্রতিটি কাজের ভেতর-বাহির, হেতু, উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট এবং খুঁটিনাটি সব বিষয়ে যিনি অবগত তিনি আল-খাবির।

আপনি প্রায়ই অনেক বিপদগ্রস্ত লোক দেখতে পাবেন, যারা সমাজে অত্যন্ত নেককার হিসেবে পরিচিত। আপনার অজান্তেই আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, এত ভালো মানুষটির এমন বিপদ কীভাবে হলো? কিন্তু আপনি তার আসল রহস্য জানেন না। ভালো মানুষটিরও কেন বিপদ হবে? তাকেও কেন মসিবত গ্রাস করবে, তা আপনি জানতে পারেন না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপন করুণায় কোনো মহৎ উদ্দেশ্যেই তাকে বিপদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু আপনার সবকিছুর সম্পর্কে সম্যক অবহিত; কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ এবং আপনার বর্তমান-ভবিষ্যতের ব্যাপারেও অবগত, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোনো মসিবত নেমে আসে, তাতে কখনো বিচলিত হবেন না। কে জানে এই সাময়িক বিপদের সেতু পার হলেই সামনে রয়েছে সৌভাগ্যের সবুজ বাগান! কত মানুষ আছে ঘর থেকে নিয়ে মসজিদ পর্যন্ত; নির্জনতা থেকে লোকালয় আর বাজার-ঘাট পর্যন্ত সবার মুখে মুখে তার প্রশংসা। আপাদমস্তক নেককার একজন মানুষ। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অঢেল সম্পদও দান করেছেন তাকে। কিন্তু কেউ কি জানে, তার এই সৌভাগ্যের স্থায়িত্ব কতদিনের? তার এই অবস্থা কি স্থায়ী হবে, না অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে—সে কথা কি কেউ বলতে পারে? কেবল আল্লাহই জানেন, অতীত-বর্তমানের সব সংবাদ। যা ঘটেনি তা যদি ঘটত তাহলে কী হতো? অথবা যদি সামনে তা ঘটে তাহলে কী হবে? সেসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবহিত মহান রব আল-খাবির, সম্যক অবগত, মহাবিজ্ঞ।

অন্তরের প্রবণতা এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এত গভীরভাবে আর কেউ কি জানতে পারে?

মানুষের জ্ঞান নিতান্ত সীমিত

একদিন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ প্রবল বেগে ঘূর্ণিঝড় শুরু হলো। দেখলাম ঝড়ের প্রকোপে একটি প্রাচীর বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম। প্রাচীর-নির্মাতারা কি জানত এখানে এত গতিবেগে বাতাস বইতে পারে? অবশ্যই তারা জানত না। জানলে তারা সর্বসাধ্য ব্যয় করে বিপদসীমার চেয়েও মজবুত করে তা নির্মাণ করত। মানুষ কীভাবে জানবে? কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে হলে তো সে ব্যাপারে আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

জটিল পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আমরা নানা উপায় খুঁজতে থাকি। বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। যেমন : কোনো যানবাহন দুর্ঘটনার শিকার হলে তাতে কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তা নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

গাড়ির কোম্পানি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে কোনো চালক ছাড়াই একটি গাড়ি ছেড়ে দেয়। গাড়ির সামনে থাকে সিমেন্ট আর কংক্রিটের তৈরি মজবুত প্রাচীর। হাই স্পিডে ছুটে গিয়ে দেওয়ালের সাথে গাড়িটির বিশাল সংঘর্ষ হয়। তখন কোম্পানি পর্যবেক্ষণ করে, যে ধাতু দ্বারা গাড়ির বডি তৈরি করা হয়েছে তাতে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতির এই মারাত্মক সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া কেমন? এবং সংঘর্ষ কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে? এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরপরও তা কত ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ে! আর যে কোম্পানি কোনো পরীক্ষা করা ছাড়াই গাড়ি তৈরি করেছে, তাদের গাড়ি তো সামান্য কোনো সমস্যার কারণেও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

মানুষের জ্ঞান কত সীমিত! কেমন বিপর্যয় ঘটতে পারে তা জানতেও তাদের অপেক্ষা করতে হয় বিপর্যয়ের আগপর্যন্ত।

আল্লাহর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি নিতান্তই সীমিত ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সম্পূর্ণ ও চিরায়ত। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সবই অর্জিত ও শ্রমলব্ধ। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান অনাদি, অনন্ত। আদিকাল থেকে মানুষের দৈহিক গঠন, শারীরিক অবকাঠামো এক ও অভিন্ন। তাতে কি এই সুদীর্ঘকালেও কোনো পরিবর্তন সাধিত

হয়েছে? অথচ আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, ১৯৯০ সালে তৈরি হওয়া গাড়ি আর ১৯৯৫ সাথে তৈরি হওয়া গাড়ি দুটির মাঝে এত বেশি ব্যবধান যা আমাদের বিস্মিত করে তোলে। প্রথমে যে ট্রেনটি আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার সামনের দিকে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত। চলাচলের সময় সে লোকজনকে সতর্ক করত। আর সেই ট্রেনের গতি একজন মানুষের হাঁটার গতির চেয়ে খুব বেশি ছিল না। অথচ বর্তমানের একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৩৬০ কিলোমিটার বেগে ছোটে। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগের টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি প্রযুক্তিতেও আপনি একই চিত্র লক্ষ করবেন। এভাবে প্রতিনিয়তই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে নতুন নতুন অনেক কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে, যা পূর্বের আবিষ্কারগুলোকে নিতান্ত ছেলেখেলায় পরিণত করছে। প্রতিটি গবেষণা-প্রযুক্তিতে যে ত্রুটি থেকে যায়, পরবর্তী গবেষণা সেটার ত্রুটি সংশোধন করে দেয়।

রোগজীবাণু বিধ্বংসী কোনো ওষুধ বা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের শুরুতে সেটা মানুষ বা প্রাণীর শরীরে স্থাপন করে দেখা হয়, ভ্যাকসিনটা জীবাণু ধ্বংস করতে পেরেছে নাকি পারেনি? এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই বিজ্ঞানীরা ওষুধপত্র আবিষ্কার করে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহ সেই অনাদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত কখনো কোনো গবেষণা, অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই আসমান, জমিন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের অভিনব অস্তিত্বদান করেছেন। এজন্যই মানুষের গবেষণার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভাবন-আবিষ্কারকে বলা হয় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান।

মাতৃগর্ভে মহাবিজ্ঞ রবের প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

মাতৃগর্ভে শিশু প্রতিপালনের যে চমৎকার ব্যবস্থাপনা তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা দেখে যে-কারো মেধা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে।

মাতৃদুগ্ধে আয়রনের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথচ রক্তের লৌহকণিকা বা হিমোগ্লোবিন তৈরি হওয়ার প্রধান উপাদানই হচ্ছে আয়রন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যদি আমরা একটি দুধের শিশুর রক্ত পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব, তাতে যথেষ্ট পরিমাণ হিমোগ্লোবিন রয়েছে। দুই বছর বয়স হওয়ার পর শিশু বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণের পূর্বপর্যন্ত শিশুর রক্তে যে পরিমাণ লৌহকণিকার প্রয়োজন, মায়ের দুধই তা সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট। যে মহান সত্তা এমন অসাধারণ ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছেন তিনি আল-খাবির।

হৃৎপিণ্ডের ওপরের ও নিচের প্রকোষ্ঠ—অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝে কে ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন? মানবদেহে রক্ত সংবহনের সাধারণ প্রক্রিয়া হলো ফুসফুস থেকে অলিন্দে রক্ত প্রবেশ করে। কিন্তু মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ফুসফুস নিষ্ক্রিয় থাকে, সেখানে না আছে কোনো বাতাস, না আছে শ্বাস-প্রশ্বাস। যেহেতু তার ফুসফুস নিষ্ক্রিয়, তাই তার রক্ত ফুসফুস থেকে অলিন্দে সঞ্চালিত না হয়ে বরং বিশেষ গহ্বরের মাধ্যমে এক অলিন্দ থেকে আরেক অলিন্দে সঞ্চালন করে। যখন শিশুটির জন্ম হয় তখন একটি রক্তপিণ্ড এসে ঐ ছিদ্রটিকে বন্ধ করে দেয়। তখন থেকে আবার স্বাভাবিক গতিতেই অলিন্দ থেকে ফুসফুস, ফুসফুস থেকে আরেক অলিন্দ হয়ে তা নিলয়ে রক্ত সঞ্চালন করে। যে মহান প্রভু এই ব্যবস্থাপনা করেছেন নিশ্চয় তিনি আল-খাবির, মহাবিজ্ঞ।

আপনি যখন হাতের নখ কাটেন, মাথার চুল কাটান, তখন কি কোনো ব্যথা অনুভব করেন? অথচ শরীরের অন্য যেকোনো স্থানেই কোনোরূপ আচড় লাগলে আপনি ব্যথায় কাতরে উঠবেন। চুল-নখ আপনার দেহের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তা কাটতে কোনো ব্যথা লাগে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা নখ ও চুলে অনুভূতি সঞ্চারক স্নায়ুতন্তু (নিউরন) সৃষ্টি করেননি। নখ ও চুলেও যদি তিনি নিউরন সৃষ্টি করতেন, তাহলে প্রতিবার চুল-নখ কাটার সময় আমাদের হাসপাতালে যেতে হতো, চেতনানাশক ইঞ্জেকশন নিতে হতো। অনুভূতি-তন্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন শরীরের হাড়-মাংসে। তাই হাড় ভেঙে গেলে মানুষ মারাত্মক ও অসহনীয় ব্যথা অনুভব করে। বেদনায় কাতরাতে থাকে। এভাবে শুধু মানুষ নয়; প্রাণিদেহেও যদি আপনি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যান, আপনি বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। আল্লাহর কুদরতের অপার কারিশমা দেখে আপনার মেধা-বুদ্ধি জমে যাবে, বিশ্বাসী হৃদয় তাঁর সম্মুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে।

এই অসাধারণ ও অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা যিনি করেন, তিনি আল-খাবির।

আপনার বাড়ির পাশের বাগানের মালীকে দেখেছেন, কত যত্ন করে গাছগুলোকে পরিচর্যা করে। সে যদি গাছে পানি দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে কী হবে? প্রথমেই গাছের সবুজ, লকলকে পাতাগুলো শুকিয়ে যাবে। পাতার রস শুকানোর পর ডালের রস শুকিয়ে যাবে। তারপর গাছের কাণ্ড শুকিয়ে যাবে। অতঃপর শিকড়ের পানি শুকাতে শুকাতে সর্বশেষ শিকড়ের মাথার পানি শুকিয়ে যাবে। গাছে যখন রস বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, কেবল তখনই গাছটি মরে যাবে, পরিণত হবে শুকনো কাঠে। একটি গাছের পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড ও শিকড়ে পর্যন্ত

তিনি রস ছড়িয়ে রেখেছেন। তাই আমরা একবার, দুবার পানি দেওয়া বন্ধ করলেও তাতে গাছের কোনো ক্ষতি হয় না; গাছটি মরে যায় না। যদি একবারেই গাছের সব রস শুকিয়ে যেত, তাহলে মাত্র একবার পানি দেওয়া বন্ধ করলেই পৃথিবীর সব গাছ মরে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অসাধারণ বিচক্ষণতায় বৃক্ষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রস ছড়িয়ে দিয়েছেন।

কারণ তিনি আল-খাবির; শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী।

যিনি অন্তরের খবরও জানেন

ডাক্তার চিকিৎসার স্বার্থে রোগীর সতরও দেখতে পারে। কিন্তু সে যদি কামনার বশবর্তী হয়ে আক্রান্ত স্থান ব্যতীত অন্য কিছু দেখে, তবু ঐ মহিলা-রোগী কখনো জানতেও পারবে না, সে আসলে ডাক্তারবেশী এক লম্পট ও দুশ্চরিত্র, যার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বীভৎস এক চেহারা! কিন্তু এই আসল চেহারা যিনি মুহূর্তের মাঝে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন তিনি সম্যক জ্ঞাত পবিত্র এক সত্তা মহান আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

চোখের অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।[১]

কাফির, মুমিন নির্বিশেষ সকল মানুষের প্রতিই তিনি ইনসাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই অমুসলিমের সাথে উত্তম আচরণও আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম। কিন্তু যখন আপনি কোনো অমুসলিমের সাথে সুব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণ করছেন, সেটা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছেন না অন্য কোনো কারণে? তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে নাকি দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য? জনসম্মুখে আপনি খুব ভণিতা-অভিনয় করে চক্ষু অবনত করে পথ চলছেন, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই, একটু আড়াল হলেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন হারামের দিকে। কেউ তা জানতে পারবে না; কিন্তু তিনি জানেন আপনার অন্তরের সব খবর।

---

[১] সূরা মুমিন, আয়াত : ১৯

বাড়ি থেকে মসজিদ পর্যন্ত সকল স্থানে আপনার আল্লাহভীতি, তাকওয়া-পরহেজগারির চর্চা। কিন্তু রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে স্মার্ট ফোন কিংবা কম্পিউটারের স্ক্রিনে আপনি ভেসে যাচ্ছেন নগ্নতার জোয়ারে, ডুবে যাচ্ছেন ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আপনার এই লৌকিকতা আর ধূর্ততার খোলস কেউ উন্মোচন করতে পারে না। কিন্তু মহাবিজ্ঞ রব আল-খাবির আপনার চেয়েও বেশি অবগত আপনার ছলচাতুরির ব্যাপারে। যেকোনো মুহূর্তে তিনি আপনার মুখোশ খুলে দিতে পারেন সকলের সামনে; যাদের সামনে লৌকিকতার চাদরে আপনি ঢেকে রেখেছেন শঠতার ভয়ানক আকৃতি। সুমহান আল্লাহ বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত।[১]

আল-খাবিরের সাথে হৃদয়ের বন্ধন

প্রতি মুহূর্তে আপনার প্রতিটি কাজের তিনি পর্যবেক্ষক। প্রকাশ্যে, গোপনে, জনতার মাঝে, লোকচক্ষুর আড়ালে এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত। আপনি যা কিছুই লুকিয়ে রাখুন না কেন, তাঁর সামনে আপনার সবকিছুই উন্মুক্ত। আপনার কোনো রহস্যই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না। গোপন পাপ আপনার কোমর ভেঙে দিয়েছে। প্রকাশ্য অপরাধ আপনার ঈমানি দেহ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মহাবিজ্ঞ রবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করুন। আপনি আবার ঈমানি শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবেন না। এটাই আল-খাবির তথা মহাবিজ্ঞ সত্তার বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণের প্রথম ফল।

ইমাম কুশাইরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মহান আল্লাহর আল-খাবির নামের প্রতি আদব প্রদর্শন প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক।' প্রতিটি কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত—এই বিশ্বাস যার অন্তরে বদ্ধমূল হবে, সে আপন কথাবার্তায়,

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩০

কাজে-কর্মে সতর্ক হয়ে যাবে। প্রতিটি পদক্ষেপে আস্থাশীল হবে এটা ভেবে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা কখনোই হাতছাড়া হবে না। আর আল্লাহ যা নির্ধারণ করেননি তা কস্মিনকালেও সে অর্জন করতে পারবে না। আল-খাবির নামের প্রতি আপনার ঈমান যত বেশি দৃঢ় হবে, পার্থিব সকল বিষয় আপনার কাছে তত সহজ হয়ে যাবে। কারণ আপনার দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই তিনি জানেন ও দেখেন। পক্ষান্তরে, যারা পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহকে বাহ্যিক কার্যকারণ বা প্রাকৃতিক কারণ মনে করে তারা সর্বদা অস্থিরতায় ভোগে।

আপনার হৃদয়ে যখন মহাবিজ্ঞ রবের প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হবে, আপনি যখন হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করবেন, আল্লাহ আপনার সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করছেন, তখন আপনি অপার্থিব এক আত্মিক শক্তি ও মনোবল অনুভব করবেন। অন্তরের বদ্ধমূল এই বিশ্বাসই অতি সংগোপনে আপনার সব প্রয়োজন তুলে ধরবে আপনার রবের কাছে। গায়েব থেকেই আপনার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ হয়ে যাবে। কারণ মানুষ যা মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহ তা শ্রবণ করেন; আর মানুষ যা অন্তর দিয়ে কামনা করে সে সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর নন।

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সন্তান চেয়ে আল্লাহর তাআলার কাছে যে দুআ করেছিলেন, তা চুপিসারেই করেছিলেন। হৃদয়ের গহীন থেকে প্রার্থনা করেছিলেন মহান রবের নিকটে।

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ۝

যখন তিনি তার রবকে চুপিসারে ডেকেছিলেন।[১]

আল্লাহর জ্ঞানের প্রতি তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাই হৃদয়ের সে ডাকেই সাড়া দিয়েছিলেন, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তাআলা।

মহাবিজ্ঞ রব আল-খাবিরের ওপর আপনার বিশ্বাস আছে তো?

পৃথিবী প্রতিনিয়তই উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকে ধাবমান। জীবনযাত্রার মান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন-প্রকরণে প্রতিটি মুহূর্তেই সাধিত হচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন।

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩

এই পরিবর্তিত বিশ্বে মহাবিজ্ঞ রব আল-খাবিরের প্রতি, তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান ও নির্দেশাবলির প্রতি আপনার আস্থা কতটুকু?

বৈধ পন্থায় আয়-উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় শরিয়ত কর্তৃক প্রজ্ঞা ও ভারসাম্যপূর্ণ কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করে দেওয়া হয়েছে। এসব মূলনীতির প্রতি লক্ষ রেখে বৈধভাবে সম্পদ উপার্জনের অনেক পদ্ধতিই শরিয়ত অনুমোদন করেছে। কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হাজারো পন্থা।

আপনি হয়তো ভাবছেন, শরিয়তের মূলনীতির আলোকে ফিকহের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ উপার্জনের যেসব পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো সময়োপযোগী নয়। পাশাপাশি এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে লাভবান হওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর বিপরীতে শরিয়ত বহির্ভূত আধুনিক পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি ফলপ্রসূ। আবার তা অনিবার্য লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই চিন্তা থেকেই আপনি হারাম পদ্ধতির বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখবেন, আকস্মিকভাবেই একদিন আপনার ব্যবসা বিরাট ক্ষতির মুখে পতিত হয়েছে।

অতএব, প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্যও আপনাকে শারয়ি বিধানের সামনেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। ব্যবসার লাভ-লোকসান শুধু মেধা-বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকেরও প্রয়োজন হয়। আর আল্লাহর তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর আনুগত্য পূর্বশর্ত। যে ব্যক্তি মনে করে, শরিয়তসম্মত উপায়ে ব্যবসা কিংবা চাকরি না করে হারাম পন্থা অনুসরণ করলে অল্প সময়ে অনেক বেশি অর্থ-কড়ি কামানো যাবে, নান্দনিক বাড়ি আর দৃষ্টিনন্দন গাড়ি কেনা যাবে, সে ব্যক্তি মূলত নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট। । সে জানে না, আল্লাহ তাআলা মহাবিজ্ঞ, তাঁর বিধানেই রয়েছে সমূহ কল্যাণের নিশ্চয়তা। তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারী নিশ্চিত হতভাগা। সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তাঁর আনুগত্যের মাঝেই নিহিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদের সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। পার্থিব

জীবনের শোভা ও চাকচিক্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশিমতো চলে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায়।[১]

যখনই আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে চলবেন, তখনই সৌভাগ্যের ফলবান বৃক্ষ থেকে ছিঁড়তে পারবেন সুমিষ্ট পাকা ফল। আর আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে বিপথগামী হলেই চরম পর্যায়ের লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। কারণ আপনি মহাবিজ্ঞ প্রভুর নির্দেশ অমান্য করেছেন।

আপনি অনেক দামি ও মূল্যবান একটি মেশিন কিনলেন, যার অপারেটিং সিস্টেম বেশ জটিল। স্বাভাবিকভাবেই আপনি ধরে নেবেন মেশিনটির আবিষ্কারক ও নির্মাতাই এর অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি অবগত। তখন আপনি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গাইডবুক সংগ্রহ করে নির্দেশনা মোতাবেক মেশিন চালিয়ে নেবেন।

দুনিয়াবি সামান্য একটা মেশিনের ক্ষেত্রে যদি আপনার এত গুরুত্ব ও আগ্রহ থেকে থাকে, তাহলে আপনার এই আশ্চর্য দেহ এবং তার মধ্যে অবস্থিত হৃদয় ও আত্মার মেশিন পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনি কেন এত উদাসীন? অথচ হৃদয়-আত্মা এবং মানবদেহের নিগূঢ় রহস্যাবলি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যার সবকিছু পরিপূর্ণভাবে এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। যেখানে রহস্যের কোনো শেষ নেই। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ও পরিচর্যার পদ্ধতি ইত্যাদি যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে, তাতেই চিন্তাশীল গবেষকরা হতভম্ব হয়েছেন।

আপনার দেহে অবস্থিত আত্মার সাথে দুনিয়াবি মেশিনের কোনো তুলনাই চলে না। চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধি, প্রেরণা, প্রত্যাশা, কামনা ইত্যাদির সমাবেশ হলো মানবাত্মা। এই আত্মা এবং তার ধারক মানবদেহ পৃথিবীর অন্য যেকোনো কিছুর তুলনায় অত্যন্ত জটিল। এর জন্য কি একটি নির্দেশিকার প্রয়োজন নেই? মেশিনের অপারেটিং সিস্টেম নির্মাতা ও আবিষ্কারক ছাড়া আর কেউ জানে না। তেমনিভাবে মানবদেহ আর মানবাত্মার পরিচালনা পদ্ধতিও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না।

[১] সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত : ২৮

তাই দেহ-আত্মার এই অমূল্য মেশিনকে পরিচালনা করার জন্য গাইডবুক তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে, যিনি এটার অভিনব স্রষ্টা, সম্যক দ্রষ্টা। জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর কাছ থেকেই দীপ্তি গ্রহণ করতে হবে, যিনি এ জীবনের অস্তিত্ব দানকারী এবং মহাবিজ্ঞ অভিভাবক। আল-খাবির বলেন—

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বলো অথবা প্রকাশ্যে বলো, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি (সৃষ্টি সম্বন্ধে) জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[১]

ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই পৃথিবীতে আপনার সবচেয়ে কাছের জিনিস হলো নিজ দেহ ও আত্মা।' তাই আত্মার জগতে কীসের আনাগোনা বা লুকোচুরি চলছে—সে বিষয়ে আপনাকে থাকতে হবে সদা জাগ্রত। আপনি আবিষ্কার করুন, আপনার মনে যেসব জল্পনা-কল্পনা, কামনা-বাসনা জেগে উঠছে, তার উৎস কোথায়? আপনার হৃদয় না প্রবৃত্তি? নাকি শয়তানের ফাঁদ? আপনি বোঝার চেষ্টা করুন, দেহসত্তার ভেতরের এসব কল্পনা-অনুভূতি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ঐশীপ্রেরণা নাকি শয়তানের কুমন্ত্রণা? আপনি যে আমলটি করছেন, তাতে কি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছেন না লৌকিকতার ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছেন?

প্রত্যেক বান্দার জন্য নিজের ঈমান, আমল ও মনোজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। হৃদয়ের সকল প্রবণতা, চারিত্রিক শিষ্টতা এবং আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে সজাগ থাকা আবশ্যক।

কোনো জটিল ব্যাপার সমাধানের প্রধান ও পূর্বশর্তই হলো, সেটাকে জটিল হিসেবে জানতে পারা। এরপর তার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। আপনি যদি গুনাহ বর্জন করতে চান, তাহলে প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে গুনাহ কী? তাই আত্মার পরিশুদ্ধির পথে সর্বপ্রথম অপরিহার্য দায়িত্ব হলো—আত্মা, প্রবৃত্তির চাহিদা-কামনার ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি লাভ করা। আর ধূর্ত নফসের প্রবঞ্চনার শিকার না হওয়া।

---

[১] সূরা মূলক, আয়াত : ১৩-১৪

আপনি যখন জেনে ফেলবেন অন্তর্জগতের গোপন ফাঁদ, যখন বুঝতে পারবেন হৃদয়ের সবুজ বাগানে ফেরেশতার পরিচর্যা বা শয়তানের আনাগোনা, যখন বুঝতে সক্ষম হবেন ইখলাসপূর্ণ ইবাদত ও লোকদেখানো ইবাদতের পার্থক্য, আখিরাতের নেশায় মত্ততার স্বাদ এবং দুনিয়ার খড়কুটোর পেছনে মোহগ্রস্ত হওয়ার পরিণাম—তখন সৃষ্টিজগতের মধ্যে আপনিই হবেন সবচেয়ে বড় বিচক্ষণ; মহাবিজ্ঞ আল-খাবির রবের সাথে হবে আপনার হৃদয়ের বন্ধুত্ব। মানুষের মাঝেই হয়তো আপনার বসবাস; কিন্তু আপনি অলংকৃত করবেন ফেরেশতাদের বরকতময় সমাবেশ।

তাই সম্যক অবগত, সর্বদ্রষ্টা, মহাবিজ্ঞ মালিক আল-খাবিরের সামনে নিজেকে সর্বদা উপস্থিত মনে করুন; যার কাছে আপনার কোনো কিছুই গোপন থাকতে পারে না।

সতর্ক হোন, আপনার সবচেয়ে কাছের দেহ ও আত্মার ব্যাপারে। আবিষ্কার করুন হৃদয়রাজ্যের কুমন্ত্রণা এবং ঐশীপ্রেরণার মাঝে বিভাজন-রেখা। মহাবিজ্ঞ রবের প্রজ্ঞাময় ব্যবস্থাপনায় হোন তৃপ্ত, প্রফুল্ল। দেখবেন, আপনার হৃদয়-আত্মা আল-খাবিরের প্রতি ঈমানে টইটম্বুর। জান্নাতি ঝরনার আর্দ্রতামাখা সমীরণ শীতল করে দেবে আপনার জীবন।

আর-রাকিব : اَلرَّقِيْبُ

মহাপর্যবেক্ষণকারী, নিরীক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক

রাতের বেলা ময়লা ফেলতে বেরিয়েছেন আপনি। ডাস্টবিনটা বেশ দূরে। অতদূর না গিয়ে ময়লা ফেললেন ঠিক প্রতিবেশীর বাড়ির দোরগোড়ায়। এদিকটা বেশ অন্ধকার। কে কী করছে বোঝার উপায় নেই। ভাবছেন, কেউ জানবে না, কে করল কাজটা। অথচ একজন ঠিকই দেখেছেন, আপনার এই হীন কর্ম। তিনি আর-রাকিব, মহাপর্যবেক্ষণকারী আল্লাহ।

☆☆☆

আপনি যদি জানতে পারেন সর্বদা আপনাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে; আপনার উপরস্থ কেউ সবসময় আপনাকে চোখে চোখে রাখছে, তখন আপনি কী করবেন? নিশ্চয় খুব সতর্ক হয়ে যাবেন। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে আপনি নিশ্চয় জানেন, আপনার একজন স্রষ্টা রয়েছে। একজন বিশ্বাসী মুমিন হিসেবে আপনি নিশ্চয় জানেন, আপনার স্রষ্টা মহান আল্লাহ; যিনি মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী। অতএব, নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, আপনি ২৪ ঘণ্টা রয়েছেন আপনার স্রষ্টার পর্যবেক্ষণের অধীনে। আপনার মতোই একজন মানুষের উপস্থিতি, পর্যবেক্ষণ টের পেয়ে আপনি চমকে ওঠেন, পরিণামের ভয়ে আঁতকে ওঠেন, নিয়ন্ত্রিত হয়ে যান; তাহলে মহান পর্যবেক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আওতায় আপনি কীভাবে লাগামহীন হয়ে পড়েন? আপনার রব বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকেও সৃষ্টি করেছেন; যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন (রাকিব)।[১]

মহামহিমাময় আর-রাকিবের সান্নিধ্যে

একবার আমি এক দোকানে ঢুকে আমার প্রয়োজনীয় একটি বস্তু চাইলাম। কিন্তু দোকানদার সেটা দিতে পারল না। আমি বেরিয়ে যাব, এমন সময় দোকানি বলল, একটু কষ্ট করে যদি গুদামে যেতেন, সেখানে পাওয়া যেতে পারে। দোকান ছিল নিচতলায় আর গুদাম চতুর্থ তলায়। গিয়ে দেখলাম সেখানে একজন হিসাবরক্ষক ও ব্যবস্থাপক টেবিলের সামনে বসে আছে। আর দুটি সিসি ক্যামেরা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার বুঝতে দেরি হলো না, নিচতলায় মালিক তাকে মনিটরে পর্যবেক্ষণ করছে।

তো এই হিসাবরক্ষক তার দিকে তাকিয়ে থাকা ক্যামেরার কারণে একটু নড়াচড়াও করতে পারছে না। মালিকের পর্যবেক্ষণের কারণে কাজের সময়ে তার একটু খাওয়াদাওয়া অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে উঠে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আরেকবার এক ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখলাম সবগুলো রুম স্বচ্ছ কাচ দিয়ে তৈরি করা। যেন জিএম সকলকে নজরদারির আওতায় রাখতে পারে। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের নজরদারি আর পর্যবেক্ষণের ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত যেন অনৈতিক কাজ করার শক্তিই সে হারিয়ে ফেলেছে।

আবার ধরুন ট্রাফিক আইনের কথা। কোনো কোনো দেশে ট্রাফিক আইন খুবই কড়া। কেউ সর্বোচ্চ গতিসীমা অতিক্রম করলেই সাথে সাথে তাকে মোটা অঙ্কের

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১

জরিমানা গুনতে হয়। ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারিতে তা বাস্তবায়নও করা হয়। এই নজরদারির কারণে কোনো ড্রাইভারের সর্বোচ্চ গতিসীমা লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই।

সামান্য মানুষের পর্যবেক্ষণে কত তটস্থ থাকেন আপনি! অথচ আপনার ওপর রয়েছে মহাশক্তিধরের পর্যবেক্ষণ; যিনি নজর রাখেন আপনার ওপর, উপরস্থ কর্মকর্তার ওপর, সবার ওপর, তিনি আপনার রব, আর-রাকিব, মহাপর্যবেক্ষণকারী।

আর-রাকিব শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—

এক. আর-রাকিব অর্থ অপেক্ষমাণ। আল্লাহ বলেছেন—

وَارْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।[১]

এখানে 'অপেক্ষমাণ' বলতে গতিবিধি পর্যবেক্ষণকে বোঝানো হয়েছে। যেমন : আল্লাহ বলেন—

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক (বান্দাদের) গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন।[২]

দুই. আর-রাকিব অর্থ সংরক্ষক।

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ

তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সংরক্ষণ করো তার পরিবারবর্গের মাধ্যমে।[৩]

---

[১] সুরা হুদ, আয়াত : ৯৩

[২] সুরা ফাজর, আয়াত : ১৪

[৩] সহিহ বুখারি : ৩৭১৩

অর্থাৎ তার পরিবারের প্রতি সদাচরণ কর। তাদের হক আদায়ে যত্নবান হও।

তিন. আর-রাকিবের আরেক অর্থ প্রহরী, অগ্রবর্তী সৈনিক, আদর্শ প্রতিনিধি; পিতার যোগ্য বংশধর।

যে ফেরেশতা আমলনামা সংরক্ষণ করেন তাকেও বলা হয় 'রাকিব' তথা প্রহরী বা প্রতিনিধি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ⑱

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য নিযুক্ত রয়েছে তৎপর প্রহরী।[১]

আল্লাহর সাথে যখন ব্যবহৃত হয় আর-রাকিব, তখন তার অর্থ হয় মহাপর্যবেক্ষক। যিনি সবকিছু জানেন; সবকিছু দেখেন। রাত্রে ঘুমানোর সময় আপনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আগামীকাল অমুক কাজটি করবেন। আপনার এই কল্পনা আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিকই সব জানেন। কুরআনে বর্ণিত—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ⑯

আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, আমি তা জানি। আমি তো তার গ্রীবাস্থিত ধমনির চেয়েও নিকটবর্তী।[২]

আপনার নীরবতা এবং উচ্চৈঃস্বর তার কাছে সমান। জনসম্মুখে আপনার ঘোষণা এবং নিঃশব্দ উচ্চারণ তার কাছে একই। মুখ ফুটে বের হওয়া আর অন্তরে লুকিয়ে রাখা সবই তার কাছে সমান। কারণ তিনি আর-রাকিব, পর্যবেক্ষণকারী।

---

[১] সুরা কাফ, আয়াত : ১৮

[২] সুরা কাফ, আয়াত : ১৬

আল্লাহর এই নামটি আপনার সবচেয়ে কাছের নাম। আপনি যখনই বিশ্বাস করে ফেলবেন, আল্লাহ আপনার সবকিছু দেখছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর হুকুম আঁকড়ে ধরবেন। আর আল্লাহর হুকুম যদি আপনি আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হন, নিশ্চিত আপনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আল্লাহ বলেন—

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং ঈমান আনয়ন করো, তাহলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।[১]

আল্লাহর এই নামটি এবং এই নামের প্রতি ঈমান আপনার সৌভাগ্যের সিঁড়ি। এই একটি নামই একজন মুমিনের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে যথেষ্ট। মুমিন যখন এই নামের ওপর ঈমান আনে, তখন সে আল্লাহর হুকুমের সামনে নত হয়; আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।

আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আর-রাকিব আপনাকে দেখছেন।

আপনি ঘরে রয়েছেন, তিনি আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

আপনি কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন, তিনি আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

আপনি হাসপাতালে রোগী দেখছেন, রোগীকে সেবা দিচ্ছেন, আপনি কিন্তু রয়েছেন তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে।

আপনি যদি একজন আইনজীবী হয়ে থাকেন, নিজের আত্মার হিসাব নিন। আপনি মক্কেলের কাছ থেকে যে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নিয়েছেন, তার হক আদায় করেছেন তো? সংশ্লিষ্ট আইনের সকল ধারা, উপধারা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরভাবে পড়াশোনা করেই মামলায় হাত দিয়েছেন তো? নাকি কোনো রকম চোখ বুলিয়েই হাজির হয়েছেন কোর্ট-চত্বরে?

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৪৭

আপনি একজন ডাক্তার। রোগীর কাছ থেকে ফি নিয়েছেন আপনার চাহিদামতো। কিন্তু তার হক আদায় করছেন কতটুকু? এটা কি শুধু আপনার অর্থ উপার্জনের বাণিজ্য নাকি আপনি সেবার মানসিকতাও লালন করেন? আপনি রোগীর অস্থিরতা, সংবেদনশীলতা উপলব্ধি করছেন তো? নাকি তাকে উল্টো ধমক দিয়ে বের করে দিচ্ছেন? ভুলে যাবেন না, আপনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে! আপনি রয়েছেন সরাসরি আপনার মালিকের পর্যবেক্ষণ সীমানায়!

যাদের অস্থি-মজ্জা এবং অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুতে আর-রাকিবের উপস্থিতি, তারা কখনো বেখেয়াল হয় না। তারা সর্বদা সৌহার্দপূর্ণ, কোমল আচরণ করে। নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেই বেশি ভালোবাসে। আপনার সামনে ফলমূলের একটি বড় থালা রাখা হলো, আর-রাকিবের প্রতি ঈমানের দাবি হলো, আপনি আরেক ভাইকে অগ্রাধিকার দেবেন। তার দিকেই সুমিষ্ট ফলটি এগিয়ে দেবেন। আনারের বড় টসটসে দানাগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দেবেন। কারণ, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। তিনি আপনার কাজ এবং অন্তরের ইচ্ছাও লক্ষ করছেন।

কুরআনে বর্ণিত—

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।[১]

আল্লাহ আপনার অনন্য সঙ্গী

আপনার বন্ধুকে আপনি প্রচণ্ড ভালোবাসেন, তার সাথে চলাফেরা, ওঠাবসা করতে পছন্দ করেন। কিন্তু আপনার যত কাছের বন্ধুই হোক না কেন, তার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আপনি তার সাথে চলতে চলতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বেন। খুব কাছের বন্ধুর উপস্থিতিও কখনো কখনো অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু আল্লাহ আপনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আপনি কখনো আল্লাহর উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়েছেন? কারণ আল্লাহ তাআলা আপনাকে সঙ্গ দান করেন অতি সূক্ষ্ম ও

---

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৮

সুকোমলভাবে। তাই আপনি টের পান না তাঁর উপস্থিতি। অথচ তিনি রয়েছেন আপনার সাথে, সবখানে; ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে, নির্জনে-প্রকাশ্যে সর্বদা তিনি রয়েছেন আপনার সঙ্গী হয়ে।

তাই আপনিও সদা-সর্বদা আল্লাহকে আপনার সঙ্গী বানিয়ে নিন। ভেবে নিন আল্লাহ আপনার সামনেই রয়েছেন। হাদিসে এটাকে বলা হয়েছে 'ইহসান'। আপনি উন্নীত হোন ইহসানের উচ্চতায়।

কোনো শ্রদ্ধেয় বড় ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাতের সময় আপনি সাধারণত নিজেকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, আদবকেতা ঠিক আছে কি না সেদিকে খুব গুরুত্ব প্রদান করেন। এরপর তার সাথে সাক্ষাতের সময় ভদ্রতার সাথে শ্রদ্ধাজড়িত কণ্ঠে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানিয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর মতো মহান ও পবিত্র সত্তা সর্বদা আপনার সাথে রয়েছেন, তাঁর প্রতি আপনি কি এতটুকুও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন? একান্ত তাঁর জন্য আদব ঠিক রাখেন?

অর্থাৎ, মানুষ যত বেশি আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকবে তার জীবন ও জীবনধারা তত বেশি সুন্দর ও কেতাদুরস্ত হবে। কারণ, আল্লাহ সর্বদাই আপনার সাথে রয়েছেন; সর্বদা তিনি আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

এক বেদুইন ব্যক্তি নবিজির কাছে এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি সুরা শিক্ষা দিন যা সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 'সুরা যিলযাল' পড়িয়ে দিলেন। যার শেষটা ছিল—

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তা-ও সে দেখতে পাবে।[১]

অতঃপর বেদুইন লোকটি বলল, ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন—এর বেশি আমার আর প্রয়োজন নেই। এরপর লোকটি চলে গেলে

[১] সুরা যিলযাল, আয়াত : ৭-৮

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোকটি সফলকাম হয়েছে, লোকটি কামিয়াব হয়েছে।[১]

আপনি চিন্তা করে দেখুন লোকটি সম্পর্কে আল্লাহর নবি এই মন্তব্য কেন করলেন? কারণ আপনি যদি জানতে পারেন আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং অণু-পরিমাণ কর্মও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তখন আপনি কি পারবেন কারো সাথে প্রতারণা করতে? কারো সাথে মিথ্যা বলতে? পারবেন কারো ক্ষতি করতে? কিংবা কোনো অনৈতিক কাজ করতে? একজন মানুষের নজরদারিতে থেকেই যেখানে আপনি সজাগ হয়ে যান, অতি সন্তর্পণে সবকিছু সামাল দেবার চেস্টা করেন, সেখানে মহান স্রষ্টার সামনে কীভাবে আপনি লাগামহীন হবেন?

এই একটি নাম এবং তার অন্তর্নিহিত আবেদন ও বার্তা আপনাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য করবে। প্রবৃত্তির লিপ্সা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি জোগাবে। আর যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখে ফেলল, সে দ্বীনের শক্ত বুনিয়াদের ওপর ঈমানি জীবনের দালান দাঁড় করিয়ে ফেলল। তাই আল্লাহর এই পরম সুন্দর নাম 'আর-রাকিব'-এর তন্ময়তায় মগ্ন থাকা হতে পারে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা; আজীবনের উত্তম নসিহত।

লুকোনোর কোনো জায়গা নেই

ইমাম রাযি রাহিমাহুল্লাহ একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। জনৈক শাইখ তার এক ছোট্ট ছাত্রকে খুব বেশি স্নেহ করতেন। এতে অন্য ছাত্ররা কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়। শাইখ একদিন ভাবলেন, তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তিনি সবাইকে একত্র করে প্রত্যেকের হাতে একটি করে পাখি দিলেন এবং বললেন, তোমরা নিজেদের পাখিটি এমন জায়গায় নিয়ে জবাই করবে, যেখানে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না।

প্রত্যেকেই একেক দিকে চলে গেল; যেন কেউ কাউকে দেখতে না পায়। ছাত্ররা সবাই নিজের মতো করে লুকিয়ে লুকিয়ে যার যার পাখি জবাই করে নিয়ে এলো। কিন্তু সেই ছোট্ট ছাত্রটি ফিরে এলো পাখিটি জবাই না করেই।

---

[১] *সুনানুন নাসায়ি* : ৭১৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৫৭৫

বিনীত স্বরে উস্তাযকে বলল, শাইখ! আপনি বলেছেন, এমন স্থানে গিয়ে পাখিটি জবাই করতে, যেখান কেউ দেখবে না। কিন্তু আমি এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাইনি যেখানে আল্লাহ আমাকে দেখতে পাবেন না!

শাইখ মুচকি হেসে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার বুঝলে তো! এ কারণেই আমি ওকে একটু বেশিই স্নেহ করি।

তাই আপনি যেখানেই লুকিয়ে থাকুন না কেন, যেখানেই আত্মগোপন করুন না কেন, আল্লাহর শক্তিশালী দৃষ্টি থেকে দূরে কোথাও যেতে পারবেন না।[১]

আল্লাহ তাআলা আপনার দিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রেখে এই কথাটিই শিক্ষা দিতে চান যে, হে বান্দা! তুমি কি আমার ব্যাপারে লজ্জা করো না? তুমি একদিন আমার সামনে উপস্থিত হবে, সেদিনটিকে তুমি কি ভয় করো না? তোমার ফিরে আসার সময় কি এখনো হয়নি?

আপনি সালাতে দাঁড়ানোর সময় কল্পনা করুন, আল্লাহ আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। সালাতে দাঁড়ানোর পূর্বেই পাক-পবিত্র ও উত্তম পোশাক পরে নিন। সামান্য কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি আপনার উন্নত মানের পোশাক পরে বের হন। অথচ সালাত আদায়ের সময় যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়ান, তখন আপনি পরেন নিম্নমানের পোশাক। কেন আপনার এই দ্বৈত নীতি? আপনি কি আল্লাহর সামনে উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না? আপনি কি বিশ্বাস করেন না, সালাতে দাঁড়ানো মানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সামনেই দাঁড়ানো? সালাফগণ সালাতের পূর্বে চুল-দাড়ি আঁচড়িয়ে পরিপাটি হয়ে নিতেন। কারণ তারা উপস্থিত হতে যাচ্ছেন মহান রবের সামনে। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

হে আদম সন্তান, তোমরা সালাতের সময় সৌন্দর্য গ্রহণ করো। তোমরা পানাহার করো কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[২]

[১] *ইতহাফু সাদাতিল মুতকিনিন বিশারহি ইহইয়াই উলুমিদ্দিন*, খণ্ড : ১৩; পৃষ্ঠা : ১৮১

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১

এই আলোচনা দ্বারা আমি আপনার সমালোচনা করছি না। আমি শুধু আপনার ঘুমন্ত চেতনাকে একটু জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছি। আপনি দুনিয়াবি কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময় যদি সুন্দর ও পরিপাটি পোশাক পরতে পারেন, তবে আল্লাহর সামনে কেন পারবেন না? মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। জুমআর দিন মুমিনের ঈদ; আনন্দোৎসব। আর আপনি হলেন সেই উৎসবের দিনে আল্লাহর ঘরের মেহমান। আপনিই বলুন, এমন বরকতপূর্ণ মাহফিলে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও নিম্নমানের পোশাক পরে যাওয়া কি সমীচীন?

তাই নবিজির সুন্নাহ হলো, জুমআর দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে, উত্তম পোশাক পরিধান করে মসজিদে গমন করা।

রাখাল-বালকের আল্লাহভীরুতা

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে মদিনার অদূরে কোথাও যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে দুপুর বেলা এক স্থানে যাত্রাবিরতি নিলেন বিশ্রামের জন্য। সবাই মিলে দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য দস্তরখান বিছিয়েছেন। ঠিক সে সময় দেখা গেল, একপাল বকরী-সহ এক রাখাল যাচ্ছে।

ইবনু উমারের ইচ্ছে হলো, তিনি রাখালের আল্লাহভীরুতা পরীক্ষা করে দেখবেন। তাই রাখালকে ডেকে বললেন, এসো আমাদের সাথে খাবারে শরিক হও। রাখাল উত্তর দিলো, আমি খেতে পারব না এখন। আমি আজ সিয়াম রেখেছি। ইবনু উমার বললেন, তুমি একটা বকরী আমাদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারো। আমরা তোমার বকরীর উপযুক্ত দাম দিয়ে দেবো। তা দিয়ে তুমি ইফতার কিনে খেতে পারবে। রাখাল বলল, এই বকরী তো আমার নয়, আমার মালিকের। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি তোমার মালিককে গিয়ে বলবে, পালের একটা বকরীকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে!

রাখাল তখন আসমানের দিকে আঙুল তুলে বলল, আমি না-হয় মিথ্যা বলে মালিকের চোখে ফাঁকি দেবো। কিন্তু আমার মালিকের যিনি মালিক (আরশের অধিপতি), তাকে আমি কীভাবে ফাঁকি দেবো? মাফ করবেন, এ কাজ আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়!

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাখালের তাকওয়া দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন।

এই রাখাল কতটুকুই বা শিক্ষিত ছিল? বাহ্যিকভাবে তার শিক্ষাদীক্ষা ছিল শূন্যের কোঠায়। কিন্তু সে দ্বীনের মূল আকিদা-বিশ্বাসের গোড়ায় পৌঁছুতে পেরেছে। আপনার বাড়িতে বিশাল বড় লাইব্রেরি রয়েছে। আলমারিগুলো বইপত্রে বোঝাই। আপনার লাইব্রেরি দেখে সকলেই আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে যায়। কিন্তু আপনি আল্লাহকে ভয় করেন না, আপনি যে আল্লাহর পর্যবেক্ষণের সীমানায় রয়েছেন তা ভুলে যাচ্ছেন। হারাম অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকছেন না, তাহলে নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখুন, আল্লাহর কাছে আপনার এই জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। পক্ষান্তরে এই অশিক্ষিত রাখাল আল্লাহর কাছে আপনার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়; অনেক বেশি মর্যাদাবান।

আজ এই রাখালের মতো ইস্পাতদৃঢ় ঈমান খুব প্রয়োজন আমাদের। আর-রাকিবের প্রতি এমন অগাধ আস্থা ভীষণ দরকার।

এমন দম্পতির দেখা মেলা ভার যারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; এমন সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যারা সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির গুণে গুণান্বিত। আজ সততা, বিশ্বস্ততার বড়ই অভাব। চারদিকে শুধু বিশ্বাসভঙ্গের জয়জয়কার, খিয়ানত ও মিথ্যা অভিনয়ের দৌরাত্ম্য। আপনি দেখবেন কত দাঈ রয়েছে, দিনের বেলায় তারা মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করছে; সবাইকে ভালো ভালো উপদেশ দিচ্ছে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ...①

হে মানব-সকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো।[১]

কিন্তু সেই তারাই আবার রাতের বেলায় পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে, যে কারণে মানুষ তাদের কথা গ্রহণ করছে না।

তাই সততা ও আত্মার শুদ্ধতা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস। অন্তর থেকেই যদি দ্বীনি চেতনা আপনাকে পথ দেখাতে না পারে, তাহলে তা নিছক অভিনয় ও শঠতা বৈ কিছু নয়।

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১

আপনি নিজেই নিজের হিসাব কষে দেখুন। আপনি কি আমানতদারিতা রক্ষা করে চলেন? কারো সাথে আপনার লেনদেন হলো, তার নথিপত্র, সাক্ষী সব উপস্থিত। তাই সময়মতো আপনি অপরপক্ষের পাওনা বুঝিয়ে দিলেন। আপনি কি ভেবে নিয়েছেন, এটা আমানতদারিতা? শুধু এতটুকু কাজ আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ যেখানে দলিল-পত্র বা সাক্ষী বিদ্যমান সেখানে আপনি পাওনা বুঝিয়ে দিতে বাধ্য। পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ না করলে তারা আপনার নামে আদালতে মামলা ঠুকে দেবে। আর আদালত আপনার কাছ থেকে তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে ছাড়বে।

আল্লাহর কাছে প্রকৃত আমানতদার তো সেই ব্যক্তি, যে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই পাওনাদারের পাওনা বুঝিয়ে দেয়। দুনিয়ার কেউ জানবে না, পাওনাদার নিজেও হয়তো জানতে পারবে না, কিন্তু শুধু আল্লাহর ভয়েই তার পাওনা ফিরিয়ে দেওয়ার নাম আমানতদারিতা। আমি একবার সালাতের পর মসজিদে বসে আছি। এমন সময় একটি চিঠি এলো আমার নামে। খুলে দেখলাম চিঠিতে লেখা, শাইখ! আমাদের এখানে এক লোক মারা গেছেন। আমি তার কাছ থেকে ২০ হাজার পাউন্ড ধার করেছিলাম। কিন্তু এটা তার পরিবারের কেউ জানত না। তবু আমি পুরোটাই পরিশোধ করে দিয়েছি।

এটাই হলো আমানতদারিতা। কেউ জানে না; তারপরও কেবল আল্লাহর ভয়ে সে হকদারের হক আদায় করেছে। কারণ আল্লাহ মহান পর্যবেক্ষক, আর-রাকিব। অনেক মানুষই এভাবে অন্যের কাছে তাদের সম্পদ রেখে মারা যায়, স্ত্রী বা সন্তানেরা কেউ জানতে পারে না। ফলে মানুষটির মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদও মৃত্যুবরণ করে। সন্তানেরা বলে, আমরা আমাদের বাবার অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কিছুই জানি না।

কিন্তু যারা বিশ্বাস করে আসমানি এই সতর্ক বার্তায়—'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সবকিছুর পর্যবেক্ষক'—তারা কখনো মৃতের হক লুকোতে পারে না। বরং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কাছে গিয়ে সম্পদ বুঝিয়ে দেয়।

একজন ঈমানদার ব্যবসায়ী কি কখনো তার পণ্যে ভেজাল মেশাতে পারে? পণ্যের কোনো দোষ থাকলে তা ক্রেতার কাছে গোপন করতে পারে?

মনে করুন, আপনি একজন তেল-বিক্রেতা। আপনার তেলের পাত্রে যদি একটি ইঁদুর মরে পড়ে থাকে, তবে আপনি কি ঐ তেল আল্লাহর বান্দাদের খাওয়াতে পারবেন? মহান রবের ওপর যদি আপনার ঈমান থেকে থাকে, তাহলে কীভাবে আপনি এই দোষ গোপন করে তা মানুষের কাছে বিক্রি করবেন?

মানুষের খাদ্যজাত গরু-ছাগলকে মোটাতাজাকরণে ব্যবহার করা হয় স্টেরয়েড হরমোন ও ইউরিয়ার মতো কিছু বিষাক্ত উপাদান। এরপর তা চড়া দামে বিক্রি করা হয় ভোক্তা আর ক্রেতাদের কাছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার সামান্য ভয়টুকু যাদের মধ্যে আছে, তারা কখনো মানুষ কিংবা পশুপাখির খাবারে এসব মেশাতে পারবে না!

দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই আমরা মুখোমুখি হই কত ধরনের খিয়ানত, ছলচাতুরি ও বিশ্বাসঘাতকতার। খাবারে ভেজালের সংমিশ্রণ, পণ্যমূল্য বাড়িয়ে বলার প্রতারণা, শঠতা ও লেনদেনে অস্বচ্ছতা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শ্বাসরুদ্ধকর জীবন থেকে মুক্তি পেতে গেলে অবশ্যই সকলকে আর-রাকিব নামটির মর্ম উপলব্ধি করে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

আল্লাহকে যে আর-রাকিব হিসেবে বিশ্বাস করে, তার জন্য আর কোনো পরিদর্শক বা নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন হয় না। কারণ আর-রাকিবের প্রতি বিশ্বাসই তাকে কর্মস্থলে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করতে বাধ্য করে।

আমার পরিচিত এক ভাই ছিল, সে প্রতিদিন দুই-এক ঘণ্টা দেরি করে অফিসে যেত; আবার কাজের মাঝখানেও কিছু সময় বিশ্রাম নিত। মাস শেষে সে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বরাবর ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করল। দরখাস্ত মঞ্জুরও হয়ে গেল। কিন্তু সে পরদিন থেকে অফিস করতে লাগল ছুটি না কাটিয়ে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানতে চাইল, কী ব্যাপার? তুমি ছুটি নিয়ে আবার অফিসে এলে কেন?

সে উত্তর দিলো, স্যার! আমি প্রতিদিন অফিসে কিছুটা দেরি করে আসতাম। আমি আমার দেরি হওয়া সময়গুলো হিসাব করে দেখলাম, এক মাসে আমি যতটুকু দেরি করেছি তা তিনদিনের সমান।

অফিসের এমডি চোখের সামনে এই অনুপম আদর্শ এবং বিরল সততা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কারণ, যে সমাজে সে বাস করে, সে সমাজে সৎ মানুষ পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর।

ঐ ভাইটি পরে আমাকে বলেছে, শাইখ! আমি যখন আপনার পরবর্তী দারসে হাজির হলাম, তখন দেখি আমাদের এমডি স্যারও দারসে এসেছেন!

আলহামদুলিল্লাহ। এটাও একটা খুশির সংবাদ। তার সততার নমুনা দেখে আরেক ভাই সত্যের সন্ধান পেয়েছে।

এজন্যই আমি ভাইদের খুব গুরুত্ব সহকারে একটি কথা বলে থাকি, আপনারা আল্লাহর নাম 'আর-রাকিব'-এর অর্থ অনুযায়ী নিজ জীবন পরিচালনা করুন। দেখবেন আপনার চলাফেরা, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা সবকিছুই হয়ে যাবে নীরব এক দাওয়াত।

সরকারি হাসপাতালের অনেক ডাক্তার ভাইদের সাথে আমার পরিচয় আছে। হাসপাতালে তারা ফ্রি চিকিৎসা করেন। হার্ট, ব্রেইন ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্ত্রোপচার-সহ বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের দায়িত্ববোধ দেখুন। একজন রোগী দুই হাজার টাকা ভিজিট দিয়ে চিকিৎসা করায়, আরেকজন মানুষ ফ্রিতে চিকিৎসা নিতে আসে; অথচ তারা এই দুজনের চিকিৎসায় কোনো পার্থক্য করেন না। ফ্রি হওয়ার কারণে একজন অভাবী মানুষকে পর্যাপ্ত সেবাটুকু দিতে কখনো কার্পণ্য করেন না।

এক আল্লাহভীরু আলিমকে জিজ্ঞেস করা হলো, কীভাবে আমরা রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় নজরের হিফাজত করতে পারি?

আলিম উত্তর দিলেন, মনে রাখবে তোমার দৃষ্টি খিয়ানত করার আগেই আল্লাহ তোমাকে দেখে ফেলেছেন, তাঁর দৃষ্টি তোমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, তার সামনে গিয়েই তোমাকে দাঁড়াতে হবে; দৃষ্টির সামান্য খিয়ানতেরও হিসাব দিতে হবে!

আপনার মনে হতে পারে বর্তমান সময়ে কীভাবে দৃষ্টি হিফাজত করা সম্ভব? নারীরা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তায় চলাফেরা করে! অফিসে, মার্কেটে, শপিংয়ে সবখানেই তাদের অবাধ বিচরণ!

আপনার সান্ত্বনার জন্য বলছি, এই যুগেও আপনার মতো অনেক টগবগে যুবক রয়েছে, যারা আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা নত করে। মহামহিম আর-রাকিবকে ভালোবেসে তারা হারাম দৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। লিফটে উঠতে গিয়ে যদি দেখে ভেতরে কেবল একজন মেয়ে, তখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকে কিংবা লিফট ছেড়ে সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠতে শুরু করে। লিফটে অল্প সময়ের জন্যও গায়রে মাহরামের সাথে নির্জনে থাকা তারা অপছন্দ করে। আপনার মতো একজন যুবক হয়ে সে যদি এভাবে আত্মসংযমের পথ বেছে নিতে পারে, তবে আপনি কেন পারবেন না? আল্লাহর এই আয়াতকে অন্তরে খোদাই করে নিন—

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

সে কি বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাকে দেখছেন?[১]

আল্লাহর নামের প্রতি বান্দার আদব

নিজের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, অনুভূতি-উপলব্ধি এবং প্রতিটি পদক্ষেপের মুহূর্তে মন-মস্তিষ্কে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির চেতনা লালন প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। তাই সব কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখুন।

ইবনু আতাউল্লাহ ইস্কান্দারি বলেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হলো সদা সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা।'

বিখ্যাত মনীষী আবু হাফস আমর ইবনু সালামা নিসাপুরি[২] বলেন, 'যখন তুমি মানুষের সামনে বসবে, তখন নিজ হৃদয়-আত্মার জন্য উপদেশদাতা হয়ে যাবে। তোমার সামনে লোকজনের ভিড় যেন তোমাকে প্রতারিত না করে; তারা দেখে তোমার বাহ্যিক অবস্থা; কিন্তু আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করেন তোমার আত্মিক ও অভ্যন্তরের অবস্থা।'

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এক লোককে বললেন, 'সর্বদা আল্লাহর

---

[১] সুরা আলাক, আয়াত : ১৪

[২] মৃত্যু : ২৬৪ হিজরি

ধ্যানে মগ্ন থাকো!’ লোকটি বলল, ‘সেটা কীভাবে করব?’ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ উত্তর দিলেন, ‘সর্বদা এমনভাবে থাকো, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ!’

চমৎকার এই দুআটি স্মৃতির কোটরে রেখে দিন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا نَخْشَاكَ كَأَنَّنَا نَرَاكَ

হে আল্লাহ, আমাদের হৃদয়ে আপনার ভয় দান করুন। আমাদেরকে এমন মগ্নতা দান করুন, যেন অনুভবে মনে হয়, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি!

আল্লাহর মুরাকাবা বা আল্লাহর ধ্যানে মগ্নতা একটি বিশাল মর্যাদার স্তর; যে ব্যক্তি এ স্তরে উন্নীত হতে পারল, সে তো জান্নাতে পৌঁছে গেল। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত সুখ-সাফল্য ধরা দিলো তার দোরগোড়ায়। তাই আল্লাহর আদেশের ওপর অটল-অবিচল থাকুন। মগ্ন থাকুন তাঁর ধ্যানে। আপনি ভুলে গেলেও তিনি আপনাকে ভুলবেন না। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি থেকে কোথায় পালাবেন আপনি?

আল-বাসির : اَلْبَصِيْرُ

সর্বদ্রষ্টা, মহাদ্রষ্টা

মিশমিশে কালো এক অন্ধকার পথ। সেই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছোট্ট একটি কালো পিঁপড়া। পথিক জানতেও পারবে না, কখন সে নিজের অজান্তে পিঁপড়াটিকে মাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ এমন এক সত্তা আছেন, যিনি দেখার জন্য আলোর মুখাপেক্ষী নন, যার দৃষ্টি থেকে আড়াল হতে পারে না কোনোকিছুই। তিনি মহান আল্লাহ, আল-বাসির।

☆☆☆

আল-বাসির—যিনি দ্রষ্টা, মহাদ্রষ্টা। শব্দটি এসেছে 'আল-বাসার' থেকে। আল-বাসার অর্থ চোখ, দর্শনেন্দ্রিয়। এর আরেক অর্থ দৃষ্টিশক্তি; দেখার জন্য প্রয়োজনীয় আলো, যা দ্বারা দর্শনযোগ্য বস্তুসমূহ অবলোকন করা যায়। দৃষ্টি যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন, বস্তুর ওপর আলো না পড়লে কিছু দেখা সম্ভব নয়। একই অবস্থা মানব-মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মেধা ও স্মৃতিশক্তি যত ধারালোই হোক না কেন, কোনো বিষয় সূর্যের মতো পরিষ্কার হলেও আল্লাহ প্রদত্ত আলোকময় দিকনির্দেশনা ছাড়া কখনোই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো, তবে তিনি তোমাদের দান করবেন ন্যায়-অন্যায় পৃথক করার শক্তি; তোমাদের পাপগুলো মুছে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যে অতিশয় করুণাময়।[১]

কুরআনে অন্যত্র তিনি বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনো। নিজগুণে তিনি তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। সেই সাথে তোমাদের দান করবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

অর্থাৎ, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের আলোকবর্তিকা না থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান বাণী না থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি পথ হারিয়ে ফেলবেন, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবেন। হয়তো আপনি নিজেই অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলবেন কিংবা অন্য কেউ আপনাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

অতএব, বাসির অর্থ দ্রষ্টা, চোখের জ্যোতিসম্পন্ন; আল-বাসিরের দৃষ্টি তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছে।

দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি

নিজের নিরাপত্তা, অস্তিত্বের সংরক্ষণ এবং নিজ কল্যাণের প্রতি আগ্রহ মানুষের মজ্জাগত। সবাই নিরাপত্তা চায়, পেতে চায় দীর্ঘায়ু। তাই যে পথে ক্ষতি, বিপদ বা কষ্টদায়ক কিছু রয়েছে, স্বভাবতই মানুষ সেদিকে পা বাড়াতে ইচ্ছুক নয়। কারণ, সে নিজের ভালো-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখে। সুখ-দুঃখ, উপকার-অপকারের সঠিক বোধই তাকে বিপদসংকুল পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ২৯

[২] সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৮

কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য চরমে পৌঁছে যায়, যখন তার দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি ঘটে; যখন সে কল্যাণকে অকল্যাণ মনে করে আর ধ্বংসকে আপন করে নেয়।

যারা দিনরাত পাপাচারে ডুবে থাকে, তারা কেন নিষিদ্ধ কাজের পেছনেই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে? কেন তারা আপন রবের বিধিবিধান অমান্য করে নিজেদের নিক্ষেপ করেছে ধ্বংসকুণ্ডে? কারণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে, তারা নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক বিকারের শিকার হয়েছে। তারা ভেবে নিয়েছে, এমন লাগামহীন জীবনই তাদের মনে অনাবিল সুখ এনে দেবে। হারাম পথে উপার্জনই তাদের নিশ্চয়তা দেবে অঢেল সম্পদের।

যদি তাদের সুস্থ মানসিকতা থাকত, তারা যদি জানত, আল্লাহর আনুগত্যেই রয়েছে একমাত্র সুখ; যদি তারা বুঝত, আল্লাহর প্রতি একাগ্রতাই কেবল পারে প্রশান্তি ও তৃপ্তি দিতে, তাহলে তারা কখনোই ঐ অন্ধকার জগতে পা বাড়াত না।

তাহলে আল্লাহর আনুগত্যকারী, একজন সৎ মুমিন আর আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত একজন পাপীর মাঝে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? মূল পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। একজন সুখ ও সাফল্য খোঁজে অন্ধকার জগতে, নর্দমার নোংরা জলে। আরেকজন সুখ, সমৃদ্ধি ও সফলতা খোঁজে আল্লাহর আনুগত্যে; নিঝুম রাতের নীরবতায় রবের সান্নিধ্যে সিজদায় লুটিয়ে।

মিসরের সম্রাজ্ঞী (আযিযে মিশরের প্রিয়তমা স্ত্রী) ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আবেদন জানিয়েছিল সকলের চোখ এড়িয়ে হারাম পথে কামনা পূর্ণ করার। তখন কী করেছিলেন নবি ইউসুফ? তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহর আশ্রয়। তিনি জানতেন তার রব আল-বাসির, সর্বদ্রষ্টা। তিনি নিশ্চয়ই এসব কিছু দেখছেন। তিনি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেবেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি তাকে সেদিন লোভনীয় হারামে জড়াতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু কী পার্থক্য তাদের দুজনার মাঝে? এত বিশাল পদমর্যাদার অধিকারী, রূপ-লাবণ্যে যার কোনো কমতি নেই, অর্থ-বৈভব যার কাছে অতি তুচ্ছ—সে কেন কুপ্রবৃত্তির লালসায় বিভোর হয়ে ছিল? সে কেন কামনার বশবর্তী হয়ে নবি ইউসুফকে জোরপূর্বক কাছে পেতে চাইছিল? আর এমন লোভনীয় প্রস্তাব হাতের কাছে পেয়েও ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন? কেন দৌড়ে পালাচ্ছিলেন মিসরের রূপবতী সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে? কারণ একটাই—দৃষ্টিভঙ্গি। একজন সুখ খুঁজেছিল প্রবৃত্তির তাড়নায়, আরেকজন সফলতা চেয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে।

যখন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ হবে, আপনার সকল কাজ এমনিতেই সুশোভিত হবে, আপনি পাবেন সাফল্যের সন্ধান। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই।

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সামনে সত্যকে সত্যরূপে দেখিয়ে দিন এবং সত্যের অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আর বাতিলকে বাতিল হিসেবেই দেখিয়ে দিন এবং তা পরিহার করার তাওফিক দিন।[১]

কত মানুষ আছে তারা সত্যকে বাতিল আর বাতিলকে সত্য মনে করে। তাই হৃদয়-জগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ঝলক নুরের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। প্রথমে আপনি মন-মানসিকতা বদলে ফেলুন এবং দৃঢ় শপথ নিন, 'সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেব, সত্যকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরব।'

মাঝে মাঝে আমার এমন কিছু যুবকের সাথে দেখা হয় যারা এই বয়সেই দ্বীন মেনে চলে, সৎ ও ঈমানী জীবন যাপন করে। তাদের সাথে দেখা হলেই আমি একটি কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলি, 'আল্লাহ আপনাকে সবচেয়ে বড় যে নিয়ামতটি দান করেছেন তা হলো হিদায়াতের নিয়ামত। আল্লাহ আপনাকে এক বিশেষ নুর দিয়েছেন, যা আপনার সামনে সত্যকে তুলে ধরে এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে উপস্থাপন করে।'

মানুষ যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে যায়, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে কর্মতৎপর হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এই আলোর ঝলক দেন। যা তার সারা জীবনের জন্য অমূল্য পাথেয় হয়ে কাজ করে।

তিনি মহাদ্রষ্টা, পরিব্যাপ্ত তাঁর দৃষ্টি

আল-বাসির আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে অন্যতম। যিনি দেখেন সৃষ্টি জগতের সবকিছু; সামনে-পিছনে, ভেতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-আড়ালে সর্বাবস্থায়ই তিনি সবকিছু দেখেন। শুধু তিনিই দেখতে পান বস্তুর প্রকৃত অবস্থা।

---

[১] *তাফসির ইবনু কাসির*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৪৪

প্রকৃত অবস্থা না জানলে কাউকে 'বাসির' বলা যায় না। আপনি অর্ধশত কোটি টাকা দিয়ে এক খণ্ড হীরা কিনে আনলেন। এরপর তা কাদায় রেখে দিলেন। কাদা থেকে তুলে সূর্যের আলোয় রাখলে দেখা যাবে তা কর্দমাক্ত। কিন্তু এটা বাহ্যিক দৃষ্টি, বাইরে কাদা লাগলেও ভেতরে কিন্তু সেটা ঠিকই মহামূল্যবান এক হীরা। 'বাসার' দ্বারা যে দৃষ্টি বোঝায় তা হলো প্রকৃত অবস্থা দর্শন।

অনেক জিনিস আমাদের দৃষ্টিতে লুকায়িত, প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু আল্লাহর সামনে সব কিছুই স্পষ্ট। আমরা হয়তো কাদায় পড়ে থাকা হীরাকে একটি নোংরা জিনিস মনে করতে পারি, কিন্তু আল্লাহ জানেন সেটা মহামূল্যবান বস্তু।

আপনার দৃষ্টিতে হয়তো একজন মানুষকে বাহ্যিকভাবে অসুন্দর লাগল, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আপনি তেমন আগ্রহী হবেন না। কিন্তু হতে পারে লোকটি পৃথিবীর সর্বাধিক জ্ঞানীদের একজন। আপনি যদি তার ভেতরের অবস্থা জানতে পারেন তাহলে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

ইতিহাসের পাতায় এমন হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে। আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহর জীবনীতে তার শারীরিক গড়ন নিয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি ছিলেন বেঁটে; চিবুক ছিল দৃষ্টিকটু, পা-দুটো বাঁকা, চোখ কোটরের ভেতরে, গলা কিছুটা স্ফীত; গায়ের রং বাদামী। এক কথায়, মানুষের কাছে অসুন্দর লাগার মতো যত কারণ থাকতে পারে তার সবকটা বৈশিষ্ট্যই তার মাঝে দেখা যেত।'

কিন্তু এই লোকটিই যখন রাগান্বিত হতেন, তখন একশো তরবারির খাপ খোলা হতো। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করত না যে, কেন তিনি রেগেছেন।

ওপরে বর্ণিত বাহ্যিক আকৃতির মানুষটা হয়তো অতি সাধারণ, কিন্তু এর আড়ালে যে আহনাফ লুকিয়ে আছেন তিনি বিখ্যাত তাবিয়ি আহনাফ ইবনু কায়স রাহিমাহুল্লাহ।

আপনার ঘরে একটি ইয়াতিম শিশু রয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইয়াতিমকে ধমক দিতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। আর আপনি যদি তাকে মারেন, যে দেখবে সে-ই তিরস্কার করবে। মানুষ আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। কিন্তু বাস্তবেই যদি সে এমন কোনো অপরাধ করে থাকে, যার সংশোধনের জন্য তাকে শাসন করা আবশ্যক এবং মানুষও সেটা জানে, তাহলে আপনাকে আর ভুল বুঝবে না। মনে করবে আপনি ঠিকই করছেন।

অভ্যন্তরীণ অবস্থা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় তারা আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে চলে আসবে। পরক্ষণে সত্য জেনে আবার তাদের ভুল ভাঙবে। আল্লাহ তাআলা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা প্রকৃত অবস্থা জেনেই গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি আল-বাসির, সর্বদ্রষ্টা। আসল ঘটনা তার সামনে প্রচ্ছন্ন ও আবৃত থাকে না। আল্লাহর সামনে সবকিছু দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট।

সব দেখছেন যিনি

আল্লাহ আপনার সবকিছু জানেন। আপনার ইচ্ছা, কামনা-বাসনা এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সবকিছু। আপনার হৃদয়ের স্বচ্ছতা, সত্যনিষ্ঠা এবং কল্যাণপ্রিয়তা আল্লাহ দেখেন। আপনি সংকটে আছেন, কষ্টে দিনাতিপাত করছেন, সেটাও কিন্তু আপনার রব দেখছেন। আপনার মুখ ফসকে একটি কথা বেরিয়ে গেল, আপনি কষ্ট পেলেন। আল্লাহ ঠিকই জানেন যে, আপনি এই কথা বলতে চাননি। এভাবে আপনার সুখ-দুখের সবকিছু আল্লাহ জানেন, দেখেন ও শোনেন। এটা আপনার জন্য বড় সান্ত্বনা; আনন্দের সংবাদ; আপনার রব আপনার সবকিছুর খবর রাখেন।

আপনি কোনো এক অফিসের কর্মচারী। টানা ৩ ঘণ্টা কাজ করার কারণে কিছুটা ক্লান্তি ও একঘেয়েমি চলে এসেছে আপনার মাঝে। তাই আপনি অল্প সময়ের জন্য একটু বারান্দার দিকে গেলেন। কিন্তু বের হতেই দেখলেন আপনার বস সামনে দাঁড়ানো। আপনাকে বের হতে দেখেই সে রাগে ফেটে পড়বে, দু-চারটা গালি দিতেও কার্পণ্য করবে না। কারণ, সে দেখেছে আপনার বাহ্যিক অবস্থা আর ভেবে নিয়েছে আপনি কাজ বাদ দিয়ে শুধু এদিক-ওদিক পায়চারিই করছেন। এর আগে যে একটানা ৩ ঘণ্টা কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছেন তা সে দেখেনি। আসলে সে অসহায়; এটা তার সীমাবদ্ধতা যে, সে বাহ্যিক অবস্থা দেখতে পেলেও অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানতে সক্ষম নয়।

কিন্তু আনন্দিত হোন আল্লাহর প্রতি। আপনার হৃদয়ের স্বচ্ছতা তিনি জেনেছেন। আপনার বস যে আপনাকে তিরস্কার করেছে, আল্লাহ জানেন, তার এই আচরণ অন্যায়। আল্লাহ দেখেছেন, আপনি এই লোকটির জন্য এতক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আপনি অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর; তাঁর অবিনশ্বর সত্তার জন্য। সকল প্রশংসা, গুণগান তাঁর জন্য, তাঁর অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞানের জন্য। তাঁর কাছে

কোনো সংবাদ পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় না। তাঁর কাছে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না; শপথ করার প্রয়োজন হয় না। তিনি জানেন সবকিছু।'

সীমিত জ্ঞানের কারণেই মানুষ সন্দেহপ্রবণ

মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। তারা কোনো কিছু দেখেই, চিন্তা-ভাবনা না করেই, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তাই নিজেকে সন্দিহান বিষয় থেকে সবসময় নিরাপদ দূরত্বে রাখুন। আপনাকে নিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ কাউকে দেবেন না। আপনাকে নিয়ে কোনো অহেতুক আলোচনার সূত্রপাত হওয়ার আগেই তার শেকড় উপড়ে ফেলুন। দেখুন আল্লাহর নবির অনুপম আদর্শ। নবিজি মসজিদে নববিতে ইতিকাফরত ছিলেন। রাতে উম্মুল মুমিনিন সাফিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহা দেখা করতে আসেন। নবিজি তার সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ সেখান দিয়ে দুজন সাহাবি গেলেন। নবিজি তাদের ডেকে বললেন, 'দাঁড়াও। ও হলো সাফিয়াহ; আমার স্ত্রী।' তারা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা আপনার ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ পোষণ করতে পারি?' নবিজি বললেন, 'না। তবে শয়তান যেন তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে বিভ্রান্ত করতে না পারে, সেজন্যই বলে দিলাম।'[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বাসির, সর্বদ্রষ্টা; তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের জ্ঞান নিতান্তই অল্প। তারা সামান্য কিছু দেখেই বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে অভ্যস্ত। তাই আপনার দায়িত্ব হলো, যেকোনো বিষয় অস্পষ্ট না রেখে খোলাসা করে দেওয়া। আপনি নিজেকে সন্দেহভাজন অবস্থানে রাখবেন আর ভাববেন, আল্লাহ তো আমাকে জানেন—এটা যথেষ্ট নয়; সুন্নাহ সমর্থিত পন্থাও নয়। বরং করণীয় এবং সুন্নাহ হলো, আপনার দিক থেকে অপবাদ, সমালোচনা বা সন্দেহের কোনো বিষয় এলে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিহত করা।

আপনি গায়রে মাহরাম কোনো নারীর ঘরে ঢুকলেন একান্তে, নির্জনে। আপনি বরফের মতো স্বচ্ছ। হয়তো ফেরেশতার চেয়েও বেশি পবিত্র। আপনি একদম খাঁটি ও সৎ একজন ব্যক্তি। আপনার প্রবৃত্তির লাগাম সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে। তবু আপনার সাথে ঐ গায়রে মাহরাম নারীর নির্জন উপস্থিতি মানুষের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবে। অপবাদ, সমালোচনার সূত্রপাত ঘটানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২০৩৫

আপনি কোনো শপিং সেন্টারের একটি দোকানে গিয়ে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। তাহলে সঙ্গো সঙ্গো ওখান থেকে বের হয়ে চলে আসুন। এটা সন্দেহজনক স্থান, দোকানির অনুপস্থিতিতে সেখানে আপনার উপস্থিতি মানুষের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে। বলবেন না যে, দোকানির জন্য অপেক্ষা করছি। বিপদসংকুল জায়গা থেকে যতটা সম্ভব নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। নতুবা আপনি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হবেন।

অবশ্য এসবই বান্দার সীমাবদ্ধতা। ওদিকে আল্লাহর জ্ঞান অপরিসীম, দৃষ্টির ফাঁকফোকর দিয়ে যে খিয়ানত করা হয় তা তিনি দেখতে পান।

আপনি আপনার রুমে বসে আছেন। সামনে কাচের জানালা, তার সামনে অন্য কারো বারান্দা। আপনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। ঠিক তখনই কোনো নারী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আপনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নারীটির দিকে। পৃথিবীর কেউ জানবে না, কোনো মানুষ কখনো আপনাকে এর জন্য জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে না; কিন্তু কেউ না দেখলেও আল্লাহ ঠিকই দেখেছেন আপনার চোখের খিয়ানত, তিনিই এর হিসাব নেবেন কড়ায় গণ্ডায়।

আপনি যে শহরে বসবাস করছেন, শহরের লোকজনের সাথে হাসিমুখে কথা বলছেন, আপনার উদারতা ও মহত্ত্বের কারণে তাদের ভালো মানুষ মনে করছেন। কিন্তু কোন শহরের মানুষ কতটুকু ভালো, কোন শহরটা পাপের রাজ্য—সে সংবাদ জানেন শুধু আল্লাহ। পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থা দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে মানুষ এতটা নিচে নামতে পারে। আপনি পশ্চিমাদের সংস্কৃতি স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারবেন না। একবার পশ্চিমা এক নারীর ব্যাপারে গণমাধ্যম বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত সে সংসদ পদপ্রার্থীও ছিল। সংবাদ সম্মেলন করে প্রচার মাধ্যমের সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করে নিজের অবৈধ প্রেম, জীবনসঙ্গীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরকীয়ার কথা খুব গর্বের সাথেই পেশ করেছিল দুনিয়াবাসীর সামনে। যা আমাদের সমাজে কল্পনাও করা যায় না। তো কোন শহরের লোকজন ভালো আর কোন শহর পাপের নরকরাজ্য তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

নূহের পর আমি অসংখ্য মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। বান্দাদের পাপাচারের খবর রাখা এবং তা পর্যবেক্ষণের জন্য আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।[১]

আল্লাহর আল-বাসির নামটি বান্দার মধ্যে এমন অনুভূতি জাগ্রত করে যে, সে সবসময় আল্লাহর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই অবস্থান করছে। এজন্য আল্লাহর নবি বলেছেন, শ্রেষ্ঠ ঈমান হলো, তুমি এটা বিশ্বাস করবে যে, তুমি আল্লাহর সাথেই আছ।

'আমি সদা আল্লাহর পর্যবেক্ষণে আছি'—এই অনুভূতি সর্বদা জাগরূক থাকাই হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'তুমি এমনভাবে ইবাদত করো, যেন আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার মতো না হও, তাহলে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।'

অর্থাৎ প্রকাশ্যে, গোপনে, লোকালয়ে, নির্জনে, নীরবতায়, জনসমাগমে—সর্বাবস্থায় আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।

আল্লাহ তাআলা দ্রষ্টা। তিনি আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন দৃষ্টিশক্তি। দু-চোখের মধ্যে আল্লাহ অসীম নিয়ামত দিয়েছেন। কর্নিয়া, আইরিশ, লেন্স, রেটিনা-সহ আরো কত কত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের এই চোখ। চোখ দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন।

নিজের নফসকে প্রশ্ন করুন, আল্লাহ তাআলা আমাদের কেন দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন? হারাম দৃষ্টিপাতের জন্য? ঈমান-বিধ্বংসী হারাম বস্তুসমূহের স্বাদ নেওয়ার জন্য? নাকি মহাবিশ্বের পরতে পরতে মহান আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য ও অসীম নিয়ামতের প্রাচুর্য দেখার জন্য?

যে চোখ নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে পবিত্র থাকে, যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়, যে চোখ আল্লাহর জন্য বিগলিত হয়, যে চোখ আল্লাহর আযাবের

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ১৭

ভয়ে সিক্ত হয়, সেই চোখ আর যে চোখ হারামের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে—এই দুই চোখ কি কখনো সমান হতে পারে?

মহান রবের প্রতি বিনীত হোন

মহান স্রষ্টা, সবকিছুর দ্রষ্টা আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন আপনার চোখ সৃষ্টিতে। এই চোখ দিয়ে আপনি দেখছেন পৃথিবীর সবকিছু; সব রংয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারছেন অনায়াসে। প্রিয়জনের প্রিয়মুখ, সন্তানসন্ততি, মা-বাবার দিকে তাকিয়ে লাভ করছেন তৃপ্তি। পবিত্র কুরআনের দিকে তাকিয়ে ধন্য করছেন আপনার চোখ; শীতল করছেন আপনার অন্তরাত্মা। এই চোখ দ্বারা এত নিয়ামত ভোগ করে এই চোখেরই স্রষ্টার সাথে নাফরমানি করা কি সাজে? চোখের স্রষ্টার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

হারামের জগতে আর কত দিন ঘোরাঘুরি? আল্লাহর অবাধ্যতায় আর কতকাল লাগামহীন জীবনযাপন?

এই চোখকে ব্যবহার করুন তার স্রষ্টাকে পাওয়ার কাজে। দু-চোখভরে দেখুন—জগৎ ও মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিয়ামতরাজি, মিটমিট করে জ্বলতে থাকা হাজারো তারার মেলা, মখমলের মতো নরম জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো, ফুলের পাপড়িতে লেগে থাকা অপরূপ সৌন্দর্য! এসবের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখুন, খুঁজে পাবেন আপনার স্রষ্টার অপার মাহাত্ম্য!

আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার রব আমাকে নয়টি বিষয়ের আদেশ প্রদান করেছেন।

সেই নয়টির মধ্যে একটি হলো—**'আমার নীরবতা যেন হয় চিন্তার মগ্নতা, আমার কথা যেন হয় আল্লাহর স্মরণ এবং আমার দৃষ্টি যেন হয় শিক্ষার উপকরণ।'**

সবসময় মনে রাখুন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। যিনি আপনার চোখ ও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি আপনাকে দেখবেন না? আল্লাহ বলেন—

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ۝

মানুষ কি মনে করে, তাকে কেউ দেখছে না? আমি কি তাকে দুটি চোখ দান করিনি? [১]

অর্থাৎ যিনি আপনার চোখ সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনার চোখের দৃষ্টি ও অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে বেখবর নন!

সুমহান রব আরো বলেন—

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝

(হে নবি!) আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহর ওপর, যিনি আপনাকে দেখতে পান, যখন আপনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং সালাত আদায়কারীদের সাথে ওঠাবসা করেন।[২]

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, জানালার কাচ আর পর্দা টেনে দিয়ে, পৃথিবীর সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে আপনি লিপ্ত হচ্ছেন মহান রবের অবাধ্যতায়। হারাম সম্পর্কের আঁচল ধরে, অবৈধভাবে তারুণ্যের শক্তি একটু একটু করে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। হারিয়ে যাচ্ছেন স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের নীল-সাদার জগতে। পচা, দুর্গন্ধময় জগতের নিকৃষ্ট ভাগাড়ে ডুব দিচ্ছেন। আপনি কখনো ভেবেছেন, এই ভবনের ছাদ ভেদ করে, জানালা, দরজা আর দেওয়ালের প্রাচীর ভেদ করে আল্লাহর দৃষ্টি আপনার দিকে তাকিয়ে আছে! তিনি চাইলে এক মুহূর্তে কেড়ে নিতে পারেন আপনার মূল্যবান চোখদুটি। অবশ করে দিতে পারেন আপনার শক্তিশালী দুটো হাত। বন্ধ দুয়ারের নিচ দিয়ে আসা অক্সিজেন বন্ধ করে দিয়ে টেনে দিতে পারেন আপনার অবাধ্যতার ইতি! কিন্তু তিনি আপনাকে সুযোগ দেন, যেন আপনি ফিরে আসেন। তিনি পথ চেয়ে থাকেন, আপনি কোনো একদিন ফিরবেন বলে!

ইমাম গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পাপাচারী পাপের কাছাকাছি হওয়ার সময় যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তাহলে সে আল্লাহর সামনে কী পরিমাণ দুঃসাহসী! কত বড় দুর্ভাগা! আর যদি মনে করে, আল্লাহ তাকে দেখছেন না,

[১] সুরা বালাদ, আয়াত : ৭-৮

[২] সুরা শুআরা, আয়াত : ২১৭-২১৯

তাহলে সে কত বড় কাফির, কত বড় গণ্ডমূর্খ! আল্লাহ তাকে দেখছেন জেনেও যদি পাপ করে ফেলে, তাহলে সেও কত বড় মূর্খ! কত বড় দুর্ভাগা!'

জ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষ আল্লাহর চোখ থেকে যা লুকোতে পারে না তা যদি মানুষের কাছ থেকে লুকায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর সাথে তামাশা করে। আর মানুষ যখন বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সর্বদ্রষ্টা, তিনি তার সবকিছুর ব্যাপারে খবর রাখেন, তখন তার হৃদয়-আত্মা আলোকিত হয়।

সালাফে সালিহিনের কেউ কেউ বলতেন, 'আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তোমার যদি পাপ করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে এমন কোথাও গিয়ে পাপ করো, যেখানে আল্লাহ তোমায় দেখতে পাবেন না!'

জীবনে যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, আপনি রয়েছেন আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিসীমার ভেতরেই। তিনি আপনার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। আপনি যখন সুখ অনুভব করছেন, জীবনের আনন্দঘন মুহূর্ত উপভোগ করছেন, তিনি দেখছেন আপনার হাসি; আপনার উচ্ছ্বাস। তখন তাঁর সামনে মাথা নত করে আদায় করুন শুকরিয়াজ্ঞাপক সিজদা।

আবার যখন আপনি ভেসে যাচ্ছেন পাপের অন্ধকার জগতে, ভুলে যাচ্ছেন গন্তব্যের কথা, ডুবে যাচ্ছেন অন্যায়-অপরাধের নর্দমায়, ভেসে যাচ্ছেন আল্লাহর অবাধ্যতার গড্ডলিকা প্রবাহে, তখনো তিনি আপনাকে দেখছেন। আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন না; কিন্তু তিনি আপনার দিকে ঠিকই তাকিয়ে আছেন। এরপর তো ফিরে যেতে হবে তাঁরই দিকে। তাই করজোড়ে মিনতি করুন—

হে আল্লাহ, আপনি আল-বাসির, সম্যক ও মহাদ্রষ্টা। আপনি আমার প্রকাশ্য-গোপন সকল দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আপনার হাতেই আমার জীবনের লাগাম। আমি ভিক্ষা চাইছি আপনার সম্মুখে। আমার হৃদয় ভরিয়ে দিন আলোতে; চোখে দান করুন জ্যোতি, যেন এর দ্বারা আমি আপনার অসীম নিয়ামতের মহিমা দেখতে পাই। প্রকাশ্যে-গোপনে, লোকালয়ে-নির্জনে সর্বাবস্থায় আপনার সামনে আদব ও সৌজন্য রক্ষা করতে চলতে পারি। আমি যেন চলি আপনার নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে, আপনার আদেশের চৌহদ্দির ভেতরে। আপনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন আপনার প্রিয় বান্দাদের কাফেলায়। আমিন।

শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অ্যারাবিক আর্টসের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি অব লিয়ন থেকে। এরপর আয়ারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ডাবলিন থেকে 'তারবিয়াহ' বিষয়ের ওপর পিএইচডি সম্পন্ন করেন ১৯৯৯ সালে। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালন'।

কর্মজীবনে তিনি দামেশক ইউনিভার্সিটিতে তারবিয়াহ ফ্যাকাল্টির প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে দামেশকের আব্দুল গনি আন-নাবুলুসি জামি মসজিদের খতিব পদে নিয়োজিত। হিকমাহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের জন্য লেখকের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। তার রচিত কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ—

১. নাযারাতুন ফিল ইসলাম।
২. তাআম্মুলাত ফিল ইসলাম।
৩. আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ।
৪. আল-হিজরাহ।
৫. মাওসুআতুল আসমাইল হুসনা।

যে তৃষ্ণার্ত হৃদয় প্রতিক্ষায় থাকে এক পশলা বৃষ্টির, যে পথভোলা পথিক খুঁজে ফেরে পথ, সঁপে দেওয়ার তাড়নায় যে নয়নযুগল হয়ে ওঠে অশ্রুসজল, পাপে নিমজ্জিত যে অন্তর অন্বেষণ করে বেড়ায় রহমতের বারিধারা, তাদের রবের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার, রবের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষুদ্র প্রয়াসই হলো 'তিনিই আমার রব'।